৭১-৭২ দুই খণ্ড একত্রে

বাংলাপিডিএফ

দস্যু বনহুর ও মিঃ হিলালী

রোমেনা আফাজ

রক্তের নেশা

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

দস্যু বনহুর ও মিঃ হেলালী-৭১
রক্তের নেশা-৭২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মিঃ ইয়াসিন যখন ভাবছে অর্থের কথা—যদি কোনো ক্রমে দুই লাখ টাকা হস্তগত করতে পারেন তাহলে তিন পুরুষকাল তাঁর কেটে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না।

তখন দস্যু বনহুর ভাবছে তার মায়ের কথা। হঠাৎ শহরের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছে, এমন সময় রহমান ফিরে আসে চৌধুরী বাড়ি থেকে—মুখখানা তার গম্ভীর ভাবাপন্ন।

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলো—সংবাদ কি রহমান?

রহমানের চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিলো—মাথা নিচু করে বললো সে—সর্দার, বেগম সাহেবার ভীষণ অসুখ।

চমকে উঠেছিলো বনহুর রহমানের কথায়—মায়ের অসুখ। কি হয়েছে তাঁর?

খুব জ্বর আজ ক'দিন থেকে। ভুল বকছেন তিনি।

ডাক্তার দেখানো হয়েছে কি?

হাঁ সর্দার, ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু একটুও অসুখ কমেনি।

বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে বলেছিলো—মাকে দেখতে যাবো।

রহমান বলেছিলো—সর্দার, পুলিশ বাহিনী যেভাবে চৌধুরী বাড়ির উপর কড়া পাহারা রেখেছে.....

মাকে দেখতে যেতেই হবে রহমান।

বনহুর চিন্তা করেছিলো কিভাবে যাবে সে চৌধুরী বাড়ি। তারপর উপায় সে খুঁজে পেয়েছিলো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে সে চলেছে, না জানি মাকে সে কেমন অবস্থায় দেখবে কে জানে.....একসময় চৌধুরী বাড়ি গাড়ি পৌঁছলো।

রাত তখন তিনটা।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন মিঃ ইয়াসিন।

ড্রাইভার এগিয়ে যাবার পূর্বেই শের আলী নেমে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

বেরিয়ে এলেন সরকার সাহেব।

বেগম সাহেবার অসুখের জন্য বাড়ির সবাই জেগে ছিলো, সরকার সাহেব কলিং বেলের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।

দরজা খুলতেই সম্মুখে পুলিশ অফিসার দেখে চমকে উঠলেন না তিনি, কারণ এটা আজ নতুন নয়। হঠাৎ এমনি করে প্রায়ই পুলিশ অফিসারগণ এসে বাড়ি খানাতল্লাশী চালিয়ে যায়। তিনি অভ্যা¯মত দরজা খুলে সরে দাঁড়ালেন।

মিঃ ইয়াসিন শের আলীসহ প্রবেশ করলেন হলঘরের মধ্যে।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—সরকার সাহেব, শের আলী আপনাদের বাড়ির মধ্যে যাবে, আপনি তাকে নিয়ে যান।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সরকার সাহেব—বেগম সাহেবা খুব অসুস্থ, এ সময়.....

মিঃ ইয়াসিন কিছু বলবার আগেই বললো শের আলী—কোনো অসুবিধা হবে না, চলুন।

সরকার সাহেব কোনো রকম মতামত প্রকাশ করবার পূর্বেই শের আলী অন্তপুরের দিকে পা বাড়ালো।

মিঃ ইয়াসিন আসন গ্রহণ করলেন।

সরকার সাহেব শের আলীর আচরণে মনে মনে কিছুটা ক্ষুদ্ধ হলেন বটে কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কোনো কথা না বলে তার পিছু পিছু অগ্রসর হলেন।

শের আলী সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেলো উপরে।

সরকার সাহেব পিছনে এগিয়েও তার নাগাল পাচ্ছেন না। শের আলী প্রতি পায়ে দু'তিনখানা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে চলেছে।

সরকার সাহেব উপরে উঠবার পূর্বেই শের আলী প্রবেশ করলো মরিয়ম বেগমের কক্ষে।

মনিরা মামীমার শিয়রে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলো, আচমকা একটি পুলিশের লোককে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মনিরা।

শের আলীবেশী দস্যু বনহুর দ্রুতহস্তে তার বিরাট গোঁফ জোড়া খুলে মাথার ক্যাপটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডাকলো—মনিরা!

মনিরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—তুমি!

মনিরা, মা কেমন আছে?

মনিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে—ওগো তুমি এসেছো? এতদিন তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারলে? তোমার জন্য মামীমা কেঁদে কেঁদে আজ তাঁর এ অবস্থা।

বনহুর মনিরার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায় মায়ের বিছানার পাশে, মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকে সে ব্যাকুল কণ্ঠে—মা, মাগো, দেখো আমি এসেছি।

মরিয়ম বেগম অজ্ঞান প্রায়, তিনি চোখ মেলে তাকালেন না। বনহুরের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছলো না।

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় ডাকলো—মা, কথা বলো! মাগো—মা...

মনিরা স্বামীর কাঁধে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বললো—তুমি পাশে থাকলে মামীমা দু'দিনেই সেরে উঠবেন। ওগো, তোমার জন্য ভেবে ভেবেই তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে।

বনহুর চাপা কান্নাকে ঠোঁট কামড়ে আটকে রেখে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো মায়ের মুখে।

ততক্ষণে সরকার সাহেব এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবেই কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। এত বিপদ মুহূর্তেও তাঁর চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে—ছোট সাহেব এসেছেন, এ যে তাঁর খুশির কথা।

বললো বনহুর—নূর কোথায়?

আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে। জবাব দিলো মনিরা।

ভাল আছে সে?

আছে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো সরকার সাহেবের দিকে, বনহুর মায়ের বিছানার পাশ থেকে উঠে এগিয়ে এলো—সরকার সাহেব, মা বাঁচবে তো? কেঁদে ফেললো বনহুর সরকার সাহেবের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো।

ছুটে এলো বাড়ির পুরোন চাকর আবদুল—আপামনি, একদল পুলিশ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে....

বনহুর ফিরে তাকালো আবদুলের দিকে।

সরকার সাহেব এবং মনিরা কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর দ্রুতহস্তে ক্যাপ ও গোঁফ তুলে নিয়ে প্রবেশ করলো বাথরুমের মধ্যে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো। পিছনের শার্শী খোলাই ছিলো, পাইপ বেয়ে নেমে এলো নিচে।

ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিন একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মরিয়ম বেগমের কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়ালেন।

কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব আর মনিরা।

মিঃ ইয়াসিনের হাতে রিভলভার।

তার পিছনে পুলিশ বাহিনীর হাতে ষ্টেনগান, হালকা মেশিনগান আর রাইফেল।

মিঃ ইয়াসিন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর কোথায়? বলুন আপনারা সে কোথায় গেলো?

সরকার সাহেব কিছু বলবার আগেই বললো মনিরা—দস্যু বনহুর এখানে? কে বললো সে এখানে এসেছে?

মিঃ ইয়াসিন ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—এই মুহূর্তে এখানে সে ছিলো।

না, আপনারা ভুল করছেন।

ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে উঠলেন মিঃ ইয়াসিন—দেখুন, ভুল আমি করছি না ভুল করছেন আপনারা। দস্যু বনহুর তার অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছে এবং তাকে আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

মনিরা তাকালো সরকার সাহেবের মুখের দিকে।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ মা, ওঁনার সঙ্গেই সে এসেছিলো।

সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না, মিঃ ইয়াসিন তার সঙ্গে আগত পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করো...

পুলিশ বাহিনী খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলো।

মিঃ ইয়াসিন বললেন—দেখুন, আপনারা ওকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। যদি পালাতে চেষ্টা করে তবে আমরা তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বো; কাজেই বলুন কোথায় আছে সে?

সরকার সাহেব বলেন—আপনারা বাড়ি খানাতল্লাশী করুন।

বেশ, যদি জীবিত ধরতে না পারি তাকে মৃত অবস্থায় আমরা গ্রেপ্তার করবো।

শিউরে উঠলো মনিরা মিঃ ইয়াসিনের কথায়।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী সমস্ত বাড়ি তল্লাশী চালাতে শুরু করে দিয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে তারা সর্বত্র।

মিঃ ইয়াসিন বাথরুমের দরজা বন্ধ দেখে দরজা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ বাথরুমের দরজা খুলে ফেললো।

বাথরুমে প্রবেশ করেই মিঃ ইয়াসিন সুউচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ঐ যে শার্শীর কাঁচ খোলা, দস্যু বনহুর ঐ পথে পালিয়ে গেছে।

এবার পুলিশ বাহিনী সবাই মিলে ছুটলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে। মিঃ ইয়াসিন সর্বাগ্রে ছুটেছেন, এমন একটা সুযোগ যেন তিনি না হারান এই তাঁর চেষ্টা।

এদিকে যখন মিঃ ইয়াসিন দলবল নিয়ে নিচে নেমে এলেন তখন বনহুর পিছন পাইপ বেয়ে নেমে এসেছে এবং দ্রুত সে এগিয়ে গেলো গাড়ি-বারান্দার নিচে থেমে থাকা জীপ গাড়িটার দিকে।

অন্যান্য পুলিশ যারা বাড়ির সম্মুখ অংশে প্রহরারত ছিলো তারা শের আলীবেশী বনহুরকে দেখে মনে করে নিজেদের লোক, কাজেই তার দিকে কেউ লক্ষ্য না করে দস্যু বনহুর যাতে না পালাতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখলো।

বনহুর পালাবার সময় গোঁফ জোড়া লাগিয়ে নিয়েছিলো নাকের নিচে, তাই তাকে কেউ চিনতে পারলো না। বনহুর সোজা জীপ গাড়িখানায় উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই বেরিয়ে গেলো চৌধুরী বাড়ির গেট পেরিয়ে।

মিঃ ইয়াসিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন গাড়ি বারান্দায়। কিন্তু ততক্ষণে জীপখানা বেরিয়ে গেছে।

মিঃ ইয়াসিন চিৎকার করে বললেন—দস্যু বনহুর পালিয়ে গেলো ... গ্রেপ্তার করো...গ্রেপ্তার করো...

সমস্ত পুলিশ বাহিনী ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিনের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

কয়েকজন বলে উঠলো—শের আলী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো.... গাড়িতে শের আলী...

মিঃ ইয়াসিন পূর্বের ন্যায় চিৎকার করে বললেন—শের আলী নয়, ওটাই দস্যু বনহুর...ওটাই দস্যু বনহুর...গাড়ি নিয়ে ওকে ফলো করো...গাড়ি নিয়ে ওকে ফলো করো...

পুলিশ বাহিনীর চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। তাদের সম্মুখ দিয়ে শের আলীবেশী দস্যু বনহুর পালিয়ে গেলো অথচ তারা তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না।

গাড়ি নিয়ে ছুটলো কয়েকজন পুলিশ।

কিন্তু কোথায় পাবে সেই জীপখানাকে যে জীপে শের আলী পালিয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত্রির জনশূন্য রাজপথে বনহুর অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন।

ফিরে আসে পুলিশ বাহিনী গাড়ি নিয়ে।

মিঃ ইয়াসিনের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মড়ার মুখের মত। ধপ্ করে বসে পড়লেন তিনি গেটের পাশে দারোয়ানের শূন্য আসনটার উপরে।

মিঃ হারেশ পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার। তিনি আজ ক'দিন হলো অবিরত চৌধুরী বাড়ির অদূরে আত্মগোপন করে এ বাড়ি পাহারা দিয়ে চলেছেন। শের আলীবেশী বনহুর যখন জীপে উঠে বসলো তখন তিনি পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অথচ তিনি জানেন না কাকে হারাচ্ছেন।

মিঃ হারেশ বললেন—স্যার, আমি জানতে পারিনি দস্যু বনহুর শের আলীর বেশে....

আমিও সবাইকে বলার সুযোগ পাইনি, কাজেই দোষ আমার.... এখন বলুন মিঃ হারেশ, আমার জীবন রক্ষার উপায় কি?

স্যার, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা সহজ কথা নয়...

তাতো বুঝলাম কিন্তু সে আমাকে বলেছিলো কোনোরকম চালাকি করতে গেলে মৃত্যু আপনার নিশ্চিত। মিঃ হারেশ, এমন সুযোগ আমি নষ্ট করতে পারবো না, তাই ভুলে গিয়েছিলাম তার সে কথা। এখন কি উপায় বলুন? কি করে জীবন রক্ষা করি...

মিঃ হারেশ বললেন—স্যার, এখানে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আপনি পুলিশ সুপারকে সব কথা জানান। নিশ্চয়ই তিনি এ ব্যাপারে আপনার জীবন রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা নেবেন।

ঠিক বলেছেন মিঃ হারেশ, এখানে আর দেরী করা আমার উচিত হবে না। জানি দস্যু বনহুর যা বলে তাই সে করে কিন্তু আমাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। দস্যু বনহুরের হাত থেকে নিজকে রক্ষা করতেই হবে...

মিঃ ইয়াসিন দু'জন পুলিশ সহ ফিরে চলেন।

রারবার কলিং বেলের শব্দে মিঃ জাফরীর ঘুম ভেংগে গেলো।

বয় এসে জানালো—স্যার, পুলিশ অফিস থেকে একজন অফিসার এসেছেন। তার সঙ্গে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ আছে।

মিঃ জাফরী বললেন—এত রাতে পুলিশ অফিস থেকে কে এসেছেন? চলো দেখি।

মিঃ জাফরী বেরিয়ে এলেন শয়নকক্ষ থেকে। ড্রইং রুমে প্রবেশ করতেই মিঃ ইয়াসিনকে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন তিনি।

মিঃ ইয়াসিন ভয়বিহ্বল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—স্যার, দুঃসংবাদ।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ জাফরী—দুঃসংবাদ?

হাঁ স্যার।

আমি মনে করেছি কোনো শুভ সংবাদ নিয়ে আপনি এসেছেন। দুঃসংবাদ কি ঘটলো আবার?

স্যার সে অনেক কথা, বসুন আমি বলছি।

মিঃ জাফরীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও কর্তব্যের খাতিরে আসন গ্রহণ করে বললেন—বলুন?

মিঃ ইয়াসিনও আসন গ্রহণ করলেন, তারপ রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন।

তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে।

মিঃ জাফরী যখন মিঃ ইয়াসিনের কথাগুলো শুনছিলেন তখন তার চোখ থেকে ঘুম দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো। রাগে-ক্রোধে ফুলে ফুলে উঠছিলেন তিনি, ঘুমের পরিবর্তে তাঁর দুচোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—আপনি অপদার্থ, তাই হাতে পেয়েও এমন সুযোগ হারিয়েছেন।

স্যার, কোনো উপায় ছিলো না, আমি প্রতি মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা নিয়েছি কিন্তু...

মিঃ ইয়াসিনকে কথা শেষ করতে দেন না মিঃ জাফরী, বলেন—সাহস পাননি, এই তো?

স্যার, দস্যু বনহুর সব সময় তার রিভলভার সজাগ রেখেছিলো।

মিঃ ইয়াসিন, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতেও সক্ষম হলেন না অথচ মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

স্যার আমাকে বাঁচান! দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারবো, এই মনোবল নিয়েই আমি তাকে পাকড়াও করতে গিয়েছিলাম। এখন কি করবো বলুন?

মিঃ জাফরী কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ভাবলেন তারপর মিঃ জায়েদীর কাছে ফোন করলেন। ...হ্যালো মিঃ জায়েদী, একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেছে, আপনি যদি দয়া করে একবার এখানে আসতেন তাহলে সম্মুখে ঘটনাটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতো। ঘটনাটা দস্যু বনহুর সংক্রান্ত। ...হ্যালো, হাঁ হাঁ, আপনি আসতে না পারলে আমরা আসবো কি?...আপনিই আসবেন...ধন্যবাদ...ধন্যবাদ...রিসিভার রেখে বলেন মিঃ জাফরী—মিঃ ইয়াসিন, অপেক্ষা করুন মিঃ জায়েদী আসছেন, তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

❑

বনহুর ভাবাপন্নভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। সমস্ত মুখমন্ডলে তার দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কপালে।

নূরী একটা রেকাবিতে কিছু ফল এবং এক গেলাস দুধ এনে বনহুরের সম্মুখস্থ টেবিলে রাখলো। তারপর টেবিল থেকে দুধের গেলাসটা তুলে নিয়ে বললো—নাও।

খিদে নেই নূরী।

না খেলে চলবে বলো? খাও একটু খানি খাও। নূরী নিজ হাতে দুধের গেলাস তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

অগত্যা দুধটুকু খেতে বাধ্য হলো বনহুর।

নূরী এবার পাশে বসে বলে—হুর; কতক্ষণ ছিলে-মায়ের পাশে?

মাত্র কয়েক মিনিট।

তিনি কোনো কথাই তোমার সঙ্গে বলেননি?

না, তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন। নূরী, জানিনা মায়ের অবস্থা এখন কেমন। বনহুর শুয়েছিলো, বিছানায় উঠে বসলো, তারপর বললো— রহমান ফিরে এসেছে কি?

বললো নূরী—না এখনও সে ফিরে আসেনি। ধীরে ধীরে সে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে চলে।

জাভেদ ছুটে আসে—আব্বু, চলো তাজের পিঠে উঠবো। আব্বু চলো...

বনহুর ওকে টেনে নেয় কাছে। আদর করে বলে—বেশ, চলো যাচ্ছি।

নূরী বললো—জাভেদ, বিরক্ত করোনা, এখন যাও।

না, আব্বুকে না নিয়ে যাবো না।

বনহুর অগত্যা জাভেদের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। জাভেদ বনহুরকে একরকম প্রায় টেনে নিয়ে চলে।

বনহুর জাভেদ সহ তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

তাজ মনিবকে দেখে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—চিঁ হিঁ...চিঁ হিঁ...

বনহুর তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করলো, তারপর বললো...তাজ দাঁড়া, জাভেদ উঠবে তোর পিঠে।

তাজ মনিবের কথা যেন বুঝতে পারলো, সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর তুলে দিলো জাভেদকে তাজের পিঠে।

জাভেদ দক্ষ অশ্বরোহীর মত ঠিক হয়ে বসলো। বনহুর লাগাম ধরে এগিয়ে চললো।

জাভেদ হাসছে—আব্বু, আমি ঘোড়া চালাচ্ছি।

বনহুরও পুত্রের হাসিতে যোগ দিয়ে বললো—বাঃ! খুব সুন্দর ঘোড়া চালাচ্ছো। ভুলে গেলো বনহুর ক্ষণিকের জন্য মায়ের চিন্তা।

নূরী কখন এসে দাঁড়িয়েছে, সে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো এ দৃশ্য। পিতা-পুত্রে অপূর্ব এ মিলন দৃশ্য নূরীকে বিমুগ্ধ অভিভূত করে ফেলে।

এখানে যখন বনহুর জাভেদকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়ে তাকে অশ্বে চাপা শেখাচ্ছিলো তখন কান্দাই শহরে চৌধুরী বাড়িতে সংজ্ঞা ফিরে আসে মরিয়ম বেগমের।

সম্পূর্ণ দু'দিন অজ্ঞান থাকার পর জ্ঞান লাভ করলেন মরিয়ম বেগম। মনিরা পাশেই ছিলো, সেদিনের ঘটনার পর একটা আনন্দ আর ব্যথা তাকে বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো। কতদিন স্বামীর দর্শন লাভ তার ভাগ্যে জোটেনি। একটা দারুণ চিন্তা সদাসর্বদা মনকে অস্থির করে রেখেছিলো না জানি সে কোথায় আছে—কেমন আছে—কোনো বিপদ-আপদ ঘটেছে কিনা, এই রকম দুশ্চিন্তা অহরহ জাগতো তার হৃদয়ে। মুহূর্তের জন্য হলেও মনিরা স্বামীকে সে একনজর দেখতে পেয়েছে, সুস্থ আছে সে এটাই তার জীবনের পরম আনন্দ। মরিয়ম বেগমের জ্ঞান ফিরতে দেখে মনিরার মনটা কিছু আশ্বস্ত হয়ে ঝুকে পড়ে ডাকে—মামীমা....মামীমা....

মরিয়ম বেগম চোখ মেলেই বলেন—উঃ মা-মাগো অসহ্য যন্ত্রণা... বুকটা আমার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো...নিজের বুকে হাত বুলান তিনি।

মনিরা লক্ষ্য করে, তার নিজের হাতখানা মামীমার বুকে বুলিয়ে দিতে থাকে। বুঝতে পারে একটা অসহ্য বেদনা তার বুকের মধ্যে গুঁমড়ে কেঁদে মরছে এবং সেই কারণেই তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার বলেছেন মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে।

মরিয়ম বেগম ডাকলেন—মা—মা মনিরা।

বলো মামীমা? এই তো আমি তোমার পাশে।

মনিরা, নূর কোথায়?

সরকার সাহেবের সঙ্গে ডাক্তারের ওখানে গেছে সে। মামীমা, তুমি ভেবোনা, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে...সে এসেছিলো...

সত্যি...সত্যি বলছিস্ মা?

হাঁ মামীমা।

আমার মনির বেঁচে আছে? ভাল আছে সে?

ভাল আছে।

তবে চলে গেলো কেন? বল্ বল্ মনিরা, সে চলে গেলো কেন?

মরিয়ম বেগমের কথায় মনিরার বুকটা হু হু করে কেঁদে উঠছিলো, কি করে বলবে সে ঐ দিনের সত্য ঘটনাটা। মনিরার দু'চোখ চাপিয়ে পানি আসছিলো, অতি কষ্টে সে নিজকে সংযত করে বলে— আবার আসবে বলে গেছে...কথাটা বলতে গলা ধরে আসে মনিরার।

মরিয়ম বেগম বলেন—আমার এ অবস্থায় সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারলো? এত বড় হৃদয়হীন সে হতে পারলো...

মামীমা, তুমি তাকে ভুল বুঝো না, তোমার ছেলে চলে যায়নি।

তবে কোথায়—কোথায় সে? বল্ বল্ মনিরা, তবে কোথায় সে?

মামীমা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠো সব বলবো।

কেন—কেন—কি হয়েছে তার?

কিছু না।

এমন সময় সরকার সাহেব, ডাক্তার এবং নূর প্রবেশ করে সেই কক্ষে।

মনিরা বলে উঠে—মামীমা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

না না, আমার মনিরকে তোমরা এনে দাও। ডাক্তার আমি চাই না। ডাক্তার আমার জন্য লাগবে না...

সরকার সাহেব বললেন—দেখুন ডাক্তার সাহেব, ওনার সংজ্ঞা থাকাকালীন উনি সব সময় শুধু সন্তানের কথা বলবেন, কিছুতেই উনাকে প্রবোধ দেওয়া যায় না।

ডাক্তার এসে মরিয়ম বেগমের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে বললেন —উনার অসুখটা তো ঐ একমাত্র কারণ। সন্তানের জন্য বেশি চিন্তা...

মরিয়ম বেগম বলে উঠেন—ডাক্তার সাহেব, আপনার কি সন্তান নেই, জানেন না সন্তানের জন্য মায়ের বুকে কত ব্যথা?

জানি বেগম সাহেবা, সব জানি। কিন্তু কি করবে, কোনো উপায় নেই তাকে ধরে রাখার। শুনলাম আপনার ছেলে ভালই আছে, আপনি অযথা বেশি চিন্তা করে নিজের অসুখ কঠিন করে ফেলেছেন।

কি করবো ডাক্তার সাহেব, বলুন আমি কি করবো?

ধৈর্য ধরুন।

না না, আমি পারবো না। আমার ছেলেকে আপনারা এনে দিন। মরিয়ম বেগম একে অসুস্থ, তারপর কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলছিলেন।

মরিয়ম বেগমের চোখের পানি দেখে সরকার সাহেব, মনিরা এবং নূর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না—তারাও চোখ মুছতে লাগলো।

ডাক্তার হলেন চৌধুরী বাড়ির প্রাইভেট ডাক্তার, তিনি বহুকাল থেকে এ বাড়িতে চিকিৎসা করে আসছেন। যখন চৌধুরী সাহেব বেঁচে ছিলেন তখন থেকে, তাঁর বয়স কম নয়—প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। এ বাড়ির সবকিছু জানেন তিনি। অনেক কথা তাঁকে হজম করতে হয় এবঙ হয়েছে। মরিয়ম বেগমের অন্তরের ব্যথা তিনি বোঝেন কিন্তু কি করবেন,এ যে কোন ওষুধ নেই। তাঁর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিলো, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রুমালে চোখ মুছলেন। যদিও তিনি জানতেন এ রোগের ওষুধ নেই তবু চিকিৎসা তাঁকে করতেই হতো।

মরিয়ম বেগমকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের ব্যবস্থার পর ডাক্তার সাহেব বিদায় নিলেন।

নূর আশ্চর্য হয়ে ভাবে, তার আব্বা কোথায় গেছেন, কেনই বা আসেন না। তার আব্বার জন্য দাদীমার কঠিন অসুখ হয়েছে। নূরেরও ভাল লাগে না, তার আব্বাকে কতদিন সে দেখেনি। তাদের স্কুলে সব ছেলেদের আব্বা আছে, তারা তো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। গেলেও দু'চার দিন বাইরে থেকেই চলে আসে। নূর নিজের চোখে কত ছেলের আব্বাকে দেখেছে কিন্তু তার আব্বার মত সুন্দর কারো আব্বা নয়। নূর মনে মনে গর্ব অনুভব করেছে...আজ নূরের মনটা আব্বার জন্য হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সে কাউকে কিছু না বলে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে। দাদীমার অবস্থা দেখে আজ যেন তারও আব্বার কথা বেশি করে মনে হচ্ছে। দাদীমার অসুখ তবু কেন তার আব্বা আসে না, অভিমানে বুক ভরে উঠে নূরের।

মনিরা এক সময় ঘরে গিয়ে দেখে নূর তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে!

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কারণ সে নূরকে কোনোদিন এমন করে কাঁদতে দেখেনি। এসে বসে তার পাশে, স্নেহভরা কণ্ঠে বলে—নূর, কি হয়েছে তোমার?

নূর কোনো কথা বলে না।

মনিরা ওর মাথাটা তুলে নেয় কোলে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—বলো. আব্বু, তুমি কেন কাঁদছো? কি হয়েছে তোমার বলো?

আম্মি, তুমি বলো—আব্বা কেন আসে না?

চমকে উঠে মনিরা। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে কেন নূর এভাবে একা একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসে, এতটুকু ছেলের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারে না। আজ নয়, এমনি বহুদিন নূর তাকে ধরে বসেছে, বলোনা আম্মি আব্বা কেন আসেনা? সবার আব্বা বাসায় থাকে, আমার আব্বা কেন চলে যায়? কোথায় যায় আমার আব্বা বলোনা...কিন্তু মনিরা কোনোদিন সন্তানের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কিই বা জবাব দেবে সে।

আজও মনিরা কোনো জবাব দিতে পারে না, নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে চলে।

নূর মাকে নীরব থাকতে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—আম্মি, সত্যি তুমি বলবে আব্বা কেন আসে না আর কোথায়ই বা গেছে? বলো আম্মি।

বুকের মধ্যে টেনে নেয় মনিরা সন্তানকে। ঠোঁট কামড়ে উচ্ছ্বসিত কান্নাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আজ দশ বছর হলো পরিচয় তার স্বামীর সঙ্গে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বামীকে সে নিজেও তেমন করে নিশ্চিতভাবে পাশে পায়নি। তার নিজের মনেই কি কম অনুযোগ তাঁর স্বামী সম্বন্ধে কিন্তু কে দেবে তার জবাব। সেও কি অন্যান্য মেয়ের মত স্বামীকে একান্ত পাশে পাবার জন্য উন্মুখ নয়? কত আকাশ কুসুম স্বপ্ন সাধ তার মনে জাগে। স্বামীকে সর্বক্ষণ পাশে পাবার জন্য মন তার আকুলি বিকুলি করে। কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে তার এ বুকে। মনিরা পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তোমার আব্বা মানুষ নয় নূর, পাষাণ...তার মধ্যে প্রাণ নেই, থাকলে সে এমন করে দূরে থাকতে পারতো না।

আম্মি, তুমি জানোনা আব্বা কোথায় গেছে?

না, জানি না।

এতবড় একটা মিথ্যা বলতে মনিরার বুকটা ধক করে উঠে যেন। শুধু আজ নয়, সন্তানের কাছে মা হয়ে তার পিতা সম্বন্ধে কত মিথ্যাই না বলতে হয়েছে আর হচ্ছে।

নূর বুঝতে পারে, তার আব্বা সম্বন্ধে কোনো কথা মাকে জিজ্ঞাসা করলে মুখখানা তার কেমন যেন নিস্প্রভ হয়ে উঠে। কোনো সময় ঠিক মত জবাব দিতে পারে ন। নূরের কচি মনে তাই দারুণ আঘাত লাগে, কেন তার আম্মা আব্বার কথা বললে জবাব দেয় না। নূর আজ মায়ের চোখে পানি দেখে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মনিরা কিছুক্ষণ নূরকে বুকে চেপে ধরে নিশ্চুপ বসে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে এক সময় শান্ত হয়ে আসে তার মন। বলে মনিরা—বাবা, তোমার দাদীমার কাছে যাও।

নূর কোন আপত্তি করে না, সে উঠে চলে যায় দাদীমার ঘরে।

মরিয়ম বেগম কখনও একটু সুস্থবোধ করেন আবার কখনও সংজ্ঞা হারান। তাঁর অসুস্থতার জন্য চৌধুরী বাড়িতে কোনো শান্তি নেই। নূরের মনেও ছিলো না। ন'বছর বয়সে অনেক বুঝতে শিখেছে সে, তার আব্বার জন্য দাদীমার মনেও যে একটা ভীষণ চিন্তা সব সময় বিরাজ করে, এটা সে জানে এবং বোঝে।

কতদিন নূর দাদীকেও জিজ্ঞাসা করেছে, দাদী আম্মা, আর সবার আব্বার মত আমার আব্বা কেন আমাদের বাড়ি থাকে না?

দাদী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, হয়তো বা কোনোদিন জবাব দিয়েছেন, আমাদের আর একটা বাড়ী আছে, সেখানে সে থাকে।

প্রশ্ন করেছিলো নূর—আব্বা সেখানে কি করে?

হঠাৎ এ প্রশ্নে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কি জবাব দেবেন তবু আমতা আমতা করে বলেছিলেন—কাজ করে।

কাজ...কি কাজ করে বলোনা দাদী আম্মা?

ঠিক আমি জানি না দাদু ভাই।

আব্বা এলে জিজ্ঞাসা করবো। বলেছিলো নূর।

কিন্তু আব্বাকে সে তেমন করে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেনি, হয়তো বা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুলেই গেছে সে কথা।

নূর দাদীমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়।

দাদীমা দুচোখ বন্ধ করে উঃ উঃ শব্দ করছেন আর মাঝে মাঝে বলছেন—মনির বাপ আমার, কেন এসেছিলি—আমাকে একনজর দেখা না দিয়েই চলে গেলি.....ওরে নিষ্ঠুর.....এত পাষাণ তুই.....

নূর নীরবে শুনছিলো, একটু আগে তার আব্বা সম্বন্ধে মাকেও সে ঐ কথা বলতে শুনেছে—সে মানুষ নয়, পাষাণ তার মধ্যে প্রাণ নেই...

নূরের মনটা কেমন যেন হয়ে যায়, ভাবে কই তার আব্বাতো মোটেই হৃদয়হীন পাষাণ নয়। কত হাসিখুশি আর সুন্দর তার আব্বা। কত আদর, কত স্নেহ করেন তিনি তাকে। এবার এলে সব কথা বলবে তার আব্বাকে কিন্তু কবে কখন আসবেন তিনি কে জানে।

নূর ডাকলো—দাদী আম্মা।

মরিয়ম বেগম চোখ মেললেন—দাদু—দাদু এসো, কোথায় ছিলি দাদু এতক্ষণ?

আম্মির ঘরে।

বস দাদু আমার পাশে।

নূর মরিয়ম বেগমের পাশে এসে বসে।

মরিয়ম বেগম তাঁর জীর্ণ হাতখানা দিয়ে নূরের হাতখানা তুলে নেন হাতের মধ্যে—দাদু।

নূরের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে মরিয়ম বেগমের হাতের উপর।

মরিয়ম বেগম বলেন—দাদু তুই কাঁদছিস? কেন কাঁদছিস্ দাদু?

দাদীর কথায় নূরের অশ্রু বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত নেমে আসে—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নূর।

মরিয়ম বেগম বলেন—একি দাদু, কাঁদছিস কেন?

দাদীমা, তুমি মরে যাবে তখন কি হবে বলো? কেউ নেই আমাদের। শামীম, সেলিম, হারুন এদের সবার আব্বা আছে, আমার আব্বাও নেই...

ছিঃ দাদু কে বললো তোমার আব্বা নেই?

তুমি যে আব্বার জন্য কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছো? একটু আগেও বললে মনির নিষ্ঠুর পাষাণ...আমি জানি, তুমি আব্বাকে না দেখতে পেয়ে সব সময় চিন্তা করো তাই তোমার এমন কঠিন অসুখ হয়েছে।

হাঁ দাদু, ঠিক বলেছিস্। দাদু, তোর আব্বা কি সত্যি সত্যি এসেছিলো?

আব্বা এসেছিলো এ কথা তোমায় কে বললো দাদীআম্মা?

তোর মা বলেছে। ওরে তোর মা বলেছে...

আম্মি বলেছে আমার আব্বা এসেছিলো? কই, আমাকে তো বলেনি আম্মি। আমার আব্বা এসেছিলো?

তাই বলছে ওরা।

তুমি দেখোনি আব্বাকে?

না, না আমি তাকে দেখিনি দাদু, তাকে দেখিনি। তুইও দেখিস্নি। তবে কি তোর আম্মি মিথ্যা কথা বলেছে। আমার অসুখ তাই মিথ্যা কথা বলে আমাকে প্রবোধ দিচ্ছে। দাদু আমি যেন অসুখে অজ্ঞান ছিলাম তুইতো ছিলি.....

মরিয়ম বেগম অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তাই এতগুলো কথা একসঙ্গে বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

নূর দাদীমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো—দাদী আম্মা, আমি আম্মির কাছে জেনে নিচ্ছি সত্যি আব্বা এসেছিলেন কিনা। যদি আব্বা এসেইছিলেন তবে আমি তাঁকে দেখিনি কেন? তুমি একটু চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমি একছুটে আম্মিকে জিজ্ঞাসা করে আসছি।

কথাটা বলেই একছুটে চলে যায় নূর।

মনিরা সবেমাত্র রান্নাঘরের দিকে এগুচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় নূর এসে দাঁড়ায়—আম্মি, সত্যি করে বলো তো আমার আব্বা এসেছিলো কিনা?

পুত্রের মুখে হঠাৎ এ কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠলো মনিরা, ঢোক গিলে বললো—এ কথা তোমাকে কে বললো?

নূর চট্ করে জবাব দিলো—দাদী আম্মা।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে মনিরা—তাঁর অসুখ, তিনি কি করে দেখলেন তোমার আব্বা এসেছিলো?

তুমি নাকি দাদী আম্মাকে বলেছো?

মনিরার মুখখানা নিস্প্রভ হয়ে যায়, বলে সে—আব্বু, তোমার দাদীমার অসুখ, তাই তাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলেছিলাম। জানো আব্বু তোমার দাদীর অসুখ তাই বুঝলে তাঁকে মিথ্যা বলেছিলাম...

এতবড় একটা মিথ্যা বলতে মনিরার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো তবু না বলে উপায় নেই। মা হয়ে আর কতদিন তার চলবে এ মিথ্যা বলা।

নূরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নীরবে ওর মাথায় হাত বুলায় মনিরা।

❑

মিঃ আহসান হঠাৎ উধাও হলেন তারপর তাঁর কোনো খোঁজখবর নেই, বিশেষ করে পুলিশ মহল তাঁর এ অন্তর্ধানে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো। লোকটা হঠাৎ গেলো কোথায়? নিশ্চয়ই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ মহলের এই ধারণা একেবারে সুদৃঢ় হলো।

মিসেস আহসান এবং হুসনার মনে আশা ছিলো, মিঃ আহসান ফিরে আসবেন কিন্তু সপ্তাহ দু'যখন চলে গেলো তবু এলো না তিনি, তখন তাঁরা বিশেষভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। পুলিশ মহলেও সাড়া পড়ে গেলো এবং সমস্ত কান্দাই শহরে মিঃ আহসানের সন্ধান চললো।

গোয়েন্দা বিভাগ ছড়িয়ে পড়েলো শহরময়, কোথাও কেউ আহসান সম্বন্ধে আলোচনা করে কিনা কিংবা তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় কিনা।

সেদিন পুলিশ অফিসে এসে হাজির হলো মিঃ ফিরোজ রিজভীর প্রধান পার্টনার মিঃ গিয়াস উদ্দিন।

পুলিশ অফিসে তখন ছিলেন মিঃ হেলালী। নতুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অল্পদিন হলো তিনি কান্দাই হীরু জেলার পুলিশ অফিসের ভার নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছে কান্দাই অফিসে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করেই কান্দাই সদর পুলিশ অফিসে এসেছেন। কেননা, দস্যু বনহুর সমন্ধে মিঃ হেলালীর বিরাট কৌতুহল রয়েছে। সেদিন দস্যু বনহুর শের আলী বেশে মিঃ ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার পর হঠাৎ শের আলীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় তারই শয়নকক্ষে খাটিয়ার নিচে। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা, পা দুটোও শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো।

অপর একজন হাওলদার কোনো কাজে ঐ কক্ষে প্রবেশ করে একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পায়, তারপর সন্ধান নিয়ে জানতে পারে শব্দটা ঠিক খাটিয়ার তল থেকে আসছে। যেমনি সে উবু হয়েছে অমনি তার নজর পড়েছে খাটিয়ার তলায় প্রায় উলঙ্গ শের আলী উপুড় হয়ে পড়ে থেকে গোঙাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে বের করে আনে শের আলীকে, তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করে—শের আলী, তোমার এ অবস্থা কেন?

শের আলী যা বলেছিলো সে কথা শুনে হাওলদার অবাক। শের আলী বলে—আমি রাতের ডিউটিতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় জমকালো পোশাক পরা একটা লোক ঘরে ঢুকলো। আমি তখন মাজায় বেল্ট কষছিলাম। জমকালো মূর্তিটা এগিয়ে আসছে দেখে আমি যেমনি খাটিয়ায় ঠেশ দেওয়া রাইফেলে হাত দিতে যাবো অমনি গম্ভীর গলায় জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—খবরদার, রাইফেলে হাত দিওনা। আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকটার মুখের নিচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা, তার চোখ দুটো শুধু দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তার হাতের রিভলভার। রিভলভারের মুখটা ঠিক আমার বুক লক্ষ্য করে উদ্যত রয়েছে। আমি শিউরে উঠলাম রাইফেলে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, আমি আমার

কোমরের বেল্টাও আর বাঁধতে পারলাম না। জমকালো মূর্তি ততক্ষণে এসে আমার বুকে রিভলভার চেপে ধরেছে তখন আমার নড়াচড়া করবার কোনো উপায় ছিলো না। জমকালো মূর্তির আচরণে আমি আশ্চর্য এবং ভীত হয়ে পড়েছিলাম, বললাম তুমি কে আর কিইবা চাও? লোকটা জবাব দিলো—আমি কিছু চাই না, শুধু তোমার দেহের ঐ পোশাকটা চাই। অবাক কণ্ঠে বলেছিলাম, পোশাক দিয়ে কি করবে? চোর-ডাকু তারা টাকা-পয়সা, সোনাদানা চায় আর তুমি চাইছো পোশাক? জমকালো মূর্তি হেসে বলেছিলো, ওসবে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমার পোশাকটা পেলেই খুশি হবো। কিন্তু আমি তাকে পোশাক দিতে রাজি হইনি, কারণ সরকারি ড্রেস আমি একজন অচেনা লোককে দিতে পারি না। যখন আমি পোশাক দিতে নারাজ হলাম তখন লোকটা আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো তারপর আমার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরলো। লোকটার দেহে সেকি সাংঘাতিক শক্তি, আমি কিছুতেই পেরে উঠলাম না, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হলো দেখি খাটিয়ার তলায় পড়ে আছি। মুখে কাপড় গোঁজা, তাই চিৎকার করতে পারলাম না, পড়েই আছি...

সব শুনে হাওলদারের চক্ষুস্থির, সে শের আলীকে একটা লুঙ্গি পরতে দিয়ে ছুটলো পুলিশ অফিসে সংবাদ দিতে।

ততক্ষণে মিঃ ইয়াসিন তাঁর দলবল নিয়ে চৌধুরী বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন পুলিশ অফিসে। অফিসে প্রচার হয়ে গেছে এ কথাটা। দস্যু বনহুর শের আলী বেশে মিঃ ইয়াসিন সহ চৌধুরী বাড়ি গিয়েছিলো এবং সেখান থেকে সে অন্তর্ধান হয়েছে।

শের আলীর উদ্ধার ঘটনাটা যদি কয়েক ঘন্টা আগে ঘটতো তাহলে হয়তো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে কিছুটা উপকার হতো। শের আলীর উদ্ধার ঘটনাটা ঘটেছিলো রাত্রির শেষভাগে ভোর হবার কিছু পূর্বে।

মিঃ হেলালী সব শোনার পর দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তিনি একজন তরুণ পুলিশ সুপার। দেহের উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, মনে অসীম বল। সি এস পি পাশ করার পর তিনি সবেমাত্র কয়েক বছর

হলো চাকরিতে জয়েন করেছেন। উদারচেতা এবং ন্যায়নীতিধর্মী লোক। অন্যায় তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

মিঃ হেলালী কান্দাই পুলিশ অফিসের চার্জ হাতে নিয়েই মেতে উঠেছেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য। প্রথমেই তিনি শের আলীকে ডেকে সেই রাতের ঘটনাটা বিস্তারিত শুনে নিলেন। মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরকে যতখানি সহজ তিনি মনে করেছেন ঠিক ততখানি নয়।

পুলিশ অফিসে বসে তিনি এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার দস্যু বনহুর সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্টগুলো মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন ঠিক ঐ সময় মিঃ গিয়াস উদ্দিন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বেশ কিছুটা উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারের সুপরিচিত হলেও মিঃ হেলালীর মোটেই পরিচিত নয় মিঃ গিয়াস উদ্দিন।

মিঃ হেলালী তাঁর সম্মুখস্থ রিপোর্টের খাতাগুলো থেকে চোখ তুলে তাকালেন।

মিঃ নিজাম উদ্দিন থানা অফিসার, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে এবং মিঃ হেলালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখ স্বাভাবিক ছিলো না, তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে পরিচয় শেষ করে নিয়ে বললেন—স্যার, একটা বিরাট দুঃসংবাদ আছে।

মিঃ হেলালী চোখ দুটো তুলে ধরলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে; বললেন—বসুন!

মিঃ গিয়াস উদ্দিন আসন গ্রহণ না কারেই উত্তেজিতভাবে বললেন —স্যার, সর্বনাশ হয়েছে। কোরা থেকে আমাদের কোম্পানীর পাঁচ বাক্স মাল এসেছে।

গিয়াস উদ্দিনের কথায় বলেন মিঃ হেলালী—মাল এসেছে এটা এমন কি দুঃসংবাদ হতে পারে মিঃ গিয়াস উদ্দিন?

স্যার, আপনি চলুন এবং দেখুন কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর ঘটনা...

বলুন কি হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হেলালী।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে, কি এমন দুঃসংবাদ যা তিনি সহজে বলতে পারছেন না।

বললেন গিয়াস উদ্দিন—স্যার চলুন, আপনি দেখুন কি ভয়ঙ্কর ঘটনা...

তবু কিছু বলবেন তো?

লাশ! পাঁচ বাক্সের মধ্যেই লাশ।

লাশ?

হঁ স্যার, মিঃ ফিরোজ রিজভী ও আমাদের আরও চারজন সহকর্মীর লাশ...

বলেন কি মিঃ গিয়াস উদ্দিন, ফিরোজ রিজভীর লাশ বাক্সে। এক সঙ্গে বলে উঠেন পুলিশ অফিসারগণ।

মিঃ হেলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলেন—কি বললেন, বাক্সে ফিরোজ রিজভীর লাশ রয়েছে?

শুধু ফিরোজ রিজভীর লাশই নয় স্যার, তাঁর সঙ্গে যে চারজন ছিলেন তাঁদেরও লাশ বাক্সে রয়েছে। স্যার, দেরী করবেন না চলুন।

মিঃ হেলালী সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদীর কাছে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের চোখেমুখে ভয়ভীতি আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি আসন গ্রহণ না করে পায়চারী করে চললেন অস্থিরভাবে।

সমস্ত পুলিশ অফিসে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠলো।

অল্পক্ষণেই এসে উপস্থিত হলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদী।

মিঃ হেলালী ঘটনাটা জানালেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন, মিঃ জাফরী এবং মিঃ জায়েদীর সুপরিচিতি—ফিরোজ রিজভীর প্রধান সহকারী ও পার্টনার, এ কথা সবাই জানেন।

গিয়াস উদ্দিন প্রায় কেঁদে ফেলে বিস্তারিত ঘটনাটা বললেন মিঃ জাফরী এবং জায়েদীর কাছে। কোরা থেকে জম্বু হয়ে তাদের কারবারের মাল এসেছে। মালের বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা হতবাক হয়ে গেছে, কারণ

মালের বাক্সে রয়েছে কয়েকটি মৃতদেহ। মৃত দেহগুলো এখনও বাক্সেই আছে, সেগুলো বাক্সের বাইরে বার করা হয়নি।

মিঃ জাফরী, মিঃ হেলালী এবং মিঃ জায়েদী ও মিঃ গিয়াস উদ্দিন চললেন কান্দাই ফিরুজা বন্দরের নিকটে দিরু ফার্মে।

গাড়ি পৌছতেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন দিরু ফার্মের সম্মুখে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে।

দিরু ফার্ম ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীদের প্রকাশ্য ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে বিদেশ থেকে বিভিন্ন মাল আমদানী হয় এবং সেই সম মাল তাদের ব্যবসাকেন্দ্রে চালান যায়। এইসব মালের মাধ্যমে চলে চোরাচালানী ব্যবসা। সহজ চোখে কেউ বুঝতে পারবে না দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে রয়েছে কি ভয়ঙ্কর রহস্যপূর্ণ কারসাজি।

দিরু ফার্মে প্রায় দু'শত কর্মচারী কাজ করে। বিরাট জায়গা নিয়ে সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা এই দিরু ফার্ম। প্রাচীরের উপরিভাগে রয়েয়ে সূতীক্ষ্ণ ঝক্‌ঝকে কাঁচের টুকরো, কারো সাধ্য নেই প্রাচীর টপকে ওপারে যায়।

সেই দিরু ফার্মের লৌহফটক খোলা।

ভিতরে একরাশ লোক ভিড় জমিয়েছে।

দিরু ফার্মের পাহারাদগণ কিছুতেই এই লোকজনকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দিতে পারছে না।

এমন সময় মিঃ জাফরী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের গাড়ির পিছনেই ছিলো মিঃ গিয়াস উদ্দিনের গাড়ি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন দিরু ফার্মের দ্বিতীয় অধিনায়ক। প্রধান অধিনায়ক ছিলেন মিঃ ফিরোজ রিজভী।

গাড়ি দু'খানা এগিয়ে আসতেই গেটের পাশে দারোয়ানদ্বয় সেলাম জানালো।

গাড়ি দু'খানা দিরু ফার্মে প্রবেশ করলো!

গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন মিঃ জাফরী, মিঃ জায়েদী, মিঃ হেলালী এবং গিয়াস উদ্দিন।

তাঁরা দেখলেন দিরু ফার্মের প্রাঙ্গণে একটি গাড়ি থেমে আছে এবং তার পাশেই পাশাপশি কয়েকটা বাক্স রয়েছে। বাক্সগুলোর চারপাশে ভিড় জমিয়ে দেখছে অনেকগুলো লোক।

মিঃ জাফরী ও তার সঙ্গী পুলিশ অফিসারগণ এগুতেই বাক্সগুলোর পাশ থেকে কিছু দূরে সরে দাঁড়ালো জনগণ।

কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা মিঃ জাফরী ও তাঁর সঙ্গীদের সেলুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ জাফরী, মিঃ হেলালী, মিঃ জায়েদী তিনজন পুলিশ অধিনায়ক এসেছেন, কারণ মিঃ ফিরোজ রিজভী সাধারণ লোক ছিলেন না, তিনি পুলিশ মহলের একজন সুপরিচিত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই তাঁরা না এসে পারলেন না।

কয়েকজন পুলিশ এবং সাধারণ পুলিশ অফিসারও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। মিঃ জাফরীর নির্দেশে বাক্সগুলোর মুখের তক্তা সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা হলো। তারা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন, এক একটি বাক্সের মধ্যে এক একটা লাশ রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটা লাশকে বাক্সে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে। কিভাবে হত্যা করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না এখনও।

মিঃ জাফরী লাশগুলো বাক্স থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন।

দু'জন পুলিশ লাশগুলো বের করে শুইয়ে রাখলো দিরু ফার্মের প্রাঙ্গণে। সবাই যেন হতবাক হয়ে পড়েছে, সবার চোখেমুখেই আতঙ্কের ছায়া। সবাই জানে, মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তাঁর চারজন সঙ্গী গত দু'সপ্তাহ হলো গোপনে কান্দাই ত্যাগ করে হিন্দল অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা চলে যাবার পর থেকে তাঁদের আর কোনোরকম সংবাদ কান্দাইবাসী জানে না। এমন কি তাঁর বিশিষ্ট সহকারী এবং পার্টনার মিঃ গিয়াস উদ্দিনও জানেন না মিঃ ফিরোজ রিজভী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কোথায় অবস্থান করছেন।

লাশগুলো বের করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠের তলায় দেখা গেলো জমাট রক্তের চাপ।

মিঃ জাফরী লাশগুলো উল্‌টানোর নির্দেশ দিলেন।

লাশ উল্‌টানোর সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চক্ষুস্থির। প্রত্যেক লাশের পিঠে এক একটি বিরাট তারকাঁটা পেরেক পোঁতা রয়েছে। পেরেকের সঙ্গে একটি টিনের চাকতি আটকানো।

মিঃ জাফরী ঝুকে পড়লেন, যদিও চাকতিগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে তবু বোঝা যাচ্ছে তাতে কিছু লিখা আছে।

একসঙ্গে সবাই চাকতির লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু সহসা লেখা পড়া গেলো না।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, লাশের পিঠ থেকে পেরেক উঠিয়ে চাকতি খুলে দেখা দরকার। চাকতিতে কি লেখা আছে বোঝা যাবে।

তাই করা হলো, লাশগুলোর পিঠ থেকে পেরেক উঠিয়ে নেবার জন্য বলা হলো।

লাশগুলো থেকে উৎকট পচা গন্ধ নির্গত হচ্ছিলো, তাই সকলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখছিলেন।

একজন ডোমকে বলা হলো লাশের পিঠ থেকে পেরেকগুলো তুলে নেওয়ার জন্য।

ডোম পুলিশ অফিসারদের আদেশ অনুযায়ী লাশগুলোর পিঠ থেকে পেরেক সহ চাকতি তুলে নিলো। কি আশ্চর্য, পেরেকগুলো প্রায় বিশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হবে। ভীষণ শক্তি দিয়ে তুলে নেওয়া হলো পেরেকগুলো।

মিঃ জায়েদী বললেন—আশ্চর্য উপায়ে এদের হত্যা করা হয়েছে, ছোরা বা পিস্তল দিয়ে নয়, লৌহ পেরেক দিয়ে।

মিঃ হেলালী বললেন—শুধু ঠান্ডা পেরেক নয়, পেরেকগুলো এদের পিঠে বিদ্ধ করার পূর্বে অগ্নিদগ্ধ করে নেওয়া হয়েছিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ মিঃ হেলালী, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। পেরেকগুলোর অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে। এত লম্বা পেরেক ইতিপূর্বে আমরা কমই দেখেছি। নিন, এবার চাকতিতে কি লেখা আছে দেখা যাক।

ডোম চাকতি খুলে নিলো পেরেক থেকে এবং পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করে নিয়ে মিঃ জাফরীর হাতে দিলো।

মিঃ জাফরী উচ্চস্বরে পড়লেন—

১ নং জল্লাদ
তার মহৎ কর্মের জন্য তাকে
পুরস্কার দেওয়া হলো।
—দস্যু বনহুর।

দ্বিতীয় চাকতি হাতে নিয়ে অবাক হলেন মিঃ জাফরী, এ চাকতি ২নং না হয়ে এটা ৩ নং ছিলো এবং পূর্ব চাকতির মতই এটাতেও লেখা ছিলো,

৩নং জল্লাদ
তাকে তার কর্মের জন্য সমুচিত
পুরস্কার দেওয়া হলো।
—দস্যু বনহুর।

এরপর ৪ নং ৫ নং কিন্তু ২ নং গেলো কোথায়? মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন—স্যার, মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে এরা চারজন গিয়েছিলো কিন্তু ২ নং না লিখে দস্যু বনহুর দ্বিতীয় জনের পিঠে ৩ নং চাকতি মেরেছে কেন বুঝতে পারছি না?

মিঃ হেলালী বললেন...দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিলো সে শুধু দস্যুতায়ই অভিজ্ঞ কিন্তু এখন দেখছি সে একজন সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, কারণ সে জানে ওদের মধ্যে ২ নং জল্লাদ নেই। কথাটা বলেই মিঃ হেলালী তাকালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে, তারপর মিঃ জাফরীর দিকে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ঢোক গিলে বললেন—দস্যু বনহুর কাকে তার ২ নং শিকারে পরিণত করবে কে জানে!

মিঃ জাফরী বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে বললেন—আমি যখন খবর শুনলাম তখনই বুঝতে পেরেছি এটা দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া কারও নয়। মিঃ ফিরোজ রিজভী দেশত্যাগ করেও নিস্তার পেলেন না।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, সঠিক জবাব দেবেন তো?

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখমন্ডল মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তারই সহকারীদের নির্মম পরিণতি তাকে একেবারে ভীত আতঙ্কিত করে তুলেছে। আজ কোটি কোটি টাকার মালিক মিঃ ফিরোজ রিজভীর বিকৃত লাশের দিকে তাকিয়ে গিয়াস উদ্দিন যেন প্রাণহীনের মত অসাড় হয়ে পড়েছেন। মিঃ জায়েদীর কথায় বললেন— দেবো স্যার।

মিঃ জাফরী লাশগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুর এদের পেরেক বিদ্ধ করে হত্যা করেছে। পেরেকগুলো এত বেশি লম্বা যার দ্বারা এদের হৃৎপিন্ড ভেদ হয়ে গেছে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যুবরণ করেছে।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ হেলালী, দস্যু বনহুর এবার তার শিকারে নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেছে। পেরেকগুলো অত্যন্ত গরম থাকায় যদিও রক্ত দেহের ভিতর জমাট বেঁধে গেছে কিন্তু গাড়ির ঝাঁকুনিতে কালো রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ...

লাশগুলো সম্বন্ধে নানাজনের নানারকম কানাঘুষা করতে শুরু করে দিয়েছে। মুহূর্তে শহরময় ছড়িয়ে পড়েলো দস্যু বনহুরের এই অদ্ভুত হত্যাকান্ডের কথা।

মিঃ জাফরী লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে আরও একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর মিঃ গিয়াসউদ্দিন সহ দিরু ফার্মের একটি কক্ষে এসে বসলেন।

ততক্ষণে লাশগুলো পুনরায় বাক্সে উঠানো শুরু হয়েছে।

ভিড়ও কমে গেছে অনেক।

সকলের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে, কারণ যাঁদের আজ হত্যা করা হয়েছে তাঁরা কান্দাইবাসীর চোখে মন্দ লোক ছিলেন না। দস্যু বনহুর এই মহৎ লোকদের কি কারণে হত্যা করলো সবাই ভেবে অস্থির হলো এবং ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লো।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ জায়েদী, আপনিই প্রশ্ন করুন।

মিঃ জায়েদী এবার জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে— আচ্ছা মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাদের বন্ধু এবং পার্টনার মিঃ ফিরোজ রিজভী কান্দাই ত্যাগ করার পর তিনি কোথায় আছেন আর কেমন আছেন, একথা আপনাকে জানিয়েছিলেন কি?

না, তিনি জানাননি। অবশ্য তিনি বলে গিয়েছিলেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁদের কুশলাদি জানাবেন এবং ব্যবসা ঠিকমতই চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি কান্দাই ত্যাগ করার পর তাঁর কোনো চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাফ কিংবা ফোন পাইনি।

তিনি কোথায় ছিলেন তাও তাহলে আপনি জানতেন না?

না স্যার। তবে জানতাম মিঃ ফিরোজ রিজভী ও আমাদের আরও চারজন একই সঙ্গে আছেন এবং তাঁরা হিন্দলে আছেন।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—কিন্তু আপনাদের মাল এসেছে কোরা শহর থেকে, তাই নয় কি?

হ্যাঁ স্যার, কোরা শহরই আমাদের ব্যবসার দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল।

প্রথম কেন্দ্রস্থল হলো কান্দাই শহর, তাই নয় কি? বললেন মিঃ হেলালী।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন—হাঁ, আপনি ঠিক, বলেছেন, আমাদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রস্থল হলো কান্দাই শহরে।

পুনরায় প্রশ্ন করলেন মিঃ হেলালী— মিঃ গিয়াস উদ্দিন, আপনাদের ব্যবসা কেন্দ্রটি কতদিনের প্রতিষ্ঠিত জানতে পারি কি?

হাঁ স্যার বলছি, প্রায় সাত বছর তবে এত বড় ছিলো না, দু'বছর হলো আমরা...

এতবড় হয়ে উঠেছেন, এইতো?

অনেক শ্রমের পরিবর্তে আমরা এত উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছিলাম।

মিঃ জায়েদী বলে উঠলেন—দস্যু বনহুরের চোখে আপনাদের উন্নতি সাধন সহ্য হলো না—কি বলেন; তাই না?

হাঁ স্যার, দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করলো। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে গেলো...প্রায় কেঁদে ফেললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন। একটু থেমে বললেন—স্যার, একটা কথা আমি প্রথম থেকেই আপনাদের কাছে গোপন করে গেছি। এখন না বলে পারছি না স্যার।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার একসঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ঢোক গিলে বললেন—স্যার, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে কয়েকদিন পূর্বে।

বলুন কি সে আশ্চর্য ঘটনা?

স্যার, ক'দিন আগের কথা...আমি অফিসে বসে কাজ করছিলাম, হঠাৎ আমার দারোয়ান এসে জানালো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন সাক্ষাৎ করতে চান। আমি বললাম, আসতে বলো। আমি মাথা নিচু করে টেবিলে কাজ করছিলাম। হঠাৎ আমার নাম উচ্চারণ করে ডাকলেন। আমি চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলাম, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিঃ আহসান সাহেব...

প্রায় একসঙ্গে বলে উঠেন পুলিশ কর্মকর্তাগণ—মিঃ আহসান!

হাঁ, তিনি একটা ওভারকোট গায়ে, চোখে গগলস্, আমার বসতে বলার অপেক্ষা না করেই বসে পড়লেন সম্মুখস্থ চেয়ারে।

সবার চোখে বিস্ময়, কারণ মিঃ আহসান প্রায় সপ্তাহ তিন হলো নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন, না তার মৃত্যু ঘটেছে।, এটাও কেউ সঠিক জানেন না। সমস্ত পুলিশ মহলে মিঃ আহসানকে নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছে—তাঁকে সন্ধান করে ফিরছে নানা স্থানে। তার বাসার আত্মীয়স্বজন শোকাকুল হয়ে পড়েছেন, এমন মুহূর্তে মিঃ আহসান সম্বন্ধে জানতে পেরে বিস্মিত হবার কথাই বটে।

বললেন মিঃ জাফরী—তারপর?

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বলতে শুরু করলেন—মিঃ আহসান আমাকে বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে বললেন, আমি মরিনি, বেঁচেইছিলাম

এবং আছি। মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গেই আছি আমি, কারণ তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করেছি।

আমি তাঁর কথা শুনে বলে উঠলাম—আপনি রিজভী সাহেবের সঙ্গে ছিলেন?

ছিলাম নয়, আছি এবং সেই কারণেই আমাকে কেউ কান্দাই শহরে দেখতে পাচ্ছে না। যা হোক, আমি এসেছিলাম এ সংবাদ কাউকে জানাবেন না, কারণ এতে রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের অমঙ্গল ঘটতে পারে। কথাগুলো বলে আহসান সাহেব পকেট থেকে একখানা চেক বের করে আমার সম্মুখে মেলে ধরলেন। একটা কথা স্যার, আমাদের কোম্পানীর যে টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন চলতো তা মিঃ রিজভী এবং আমার সই দ্বারাই হতো। চেকে রিজভীর সই দেখলাম। মিঃ আহসান আমাকে চেকে সই করার জন্য অনুরোধ করলেন। চেকে টাকার কোনো অঙ্ক লেখা না থাকায় আমি ইতস্তত করছিলাম। মিঃ আহসান হেসে বললেন—আপনি নিঃসঙ্কোচে সই দিতে পারেন, কারণ আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখুন স্যার, মিঃ আহসান আমার অতি পরিচিত এবং পরম বন্ধু স্থানীয়, কাজেই আমি কোনো দ্বিধা না করে সই দিলাম।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ হেলালী—মিঃ আহসান তাহলে চেকে সই নিতেই এসেছিলেন?

হাঁ, তিনি চেকে সই নিয়েই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—এতবড় একটা জরুরী সংবাদ আপনি চেপে গেছেন?

মিঃ আহসানের অনুরোধে এবং আমার পরম বন্ধু মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের মঙ্গলার্থে আমি কথাটা চেপে গিয়েছিলাম স্যার।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন—হু! তারপর বললেন—মিঃ আহসান তাহলে জীবিত আছেন এবং মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ছিলেন। আশ্চর্য বটে...

মিঃ জায়েদী বললেন—একেবারে বিস্ময়কর ব্যাপার। মিঃ আহসান এভাবে আত্মগোপন করে রয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। মিঃ রিজভী ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গেই যদি থাকবেন তবে তিনি কি করছেন? আজ যে লাশগুলো এসেছে, এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে মিঃ আহসান জড়িত আছেন কিনা। তবে কি মিঃ আহসান দস্যু বনহুরকে সহায়তা করে চলেছেন?

মিঃ জায়েদী কথগুলো বলে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—বিরাট একটা রহস্য আজ আমাদের সম্মুখে পাকিয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই এই রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছেন মিঃ আহসান।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, যত কিছুর মূলে রয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কান্দাই আসার পর দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার শুধু চক্ষুস্থিরই হয়নি, আমি এক অদ্ভুত রহস্যের অতলে তলিয়ে গেছি। স্যার, আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করবোই করবো।

ধন্যবাদ মিঃ হেলালী, আপনার এ যাত্রা যেন জয়যুক্ত হয়। বললেন মিঃ জায়েদী।

মিঃ জাফরী বললেন—আপনি এগুতে থাকেন, আমরা আছি আপনার সঙ্গে।

মিঃ হেলালী হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন দু'জন পুলিশ প্রধানের সঙ্গে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন বললেন এবার—স্যার, আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না, না জানি কখন আমার ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে!

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখোভাব অত্যন্ত ভয়ার্ত ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলো, তিনি অসহায় কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ জাফরী বললেন—দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই মিঃ গিয়াস উদ্দিন। আজ থেকে আপনার জন্য পুলিশ গার্ড ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া আপনার বাসা এবং আপনাদের দিরু ফার্মে পাহারার ব্যবস্থা করা হবে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন—মিঃ জাফরী, এখন আপনারা আমার সহায়ক। আপনারা যদি আমাকে না রক্ষা করেন তাহলে দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা না করে ছাড়বে না।

মিঃ জাফরীই বললেন আবার—মিঃ গিয়াস, আপনি বেশি উত্তেজিত হবেন না। দস্যু বনহুর আপনার কেশ স্পর্শ করতেও সক্ষম হবে না, আপনার জন্য আমরা সেই রকম ব্যবস্থা নেবো যে রকম ব্যবস্থা আমরা মিঃ ইয়াসিনের জন্য নিয়েছি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

❑

সমস্ত শহরময় যখন মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে তখন চৌধুরী বাড়িতে মরিয়ম বেগম মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পুত্রের দেখা না পেয়ে তিনি দিন দিন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তার বলেছেন, অচিরে তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটানো প্রয়োজন, নাহলে তাঁকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব হবে না।

মনিরা অবিরত চোখের পানি ফেলে চলেছে। সে শাশুড়ী আম্মাকে কি সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। তাঁর সন্তান এসেছিলো এ কথা বারবার বলেছে সে কিন্তু মরিযম বেগম তাতে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাননি, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তার মনির বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে।

কেন যে তিনি হঠাৎ সন্তানের জন্য এত উতলা হয়ে পড়েছেন একমাত্র আল্লাহই জানেন।

মনিরা যখন শুনতে পেলো তার স্বামী নতুন উদ্যমে আবার নরহত্যা শুরু করেছে তখন সে একেবারে মুষড়ে পড়লো। কথাটা কাউকে বলবে সে উপায় নেই। মামীমা ভয়ানক অসুস্থ, নাহলে তিনি শুধু বুঝতেন তার মনের কথা। নূর কিছু বোঝে না, তাকে এসব জানানোও যাবে না কোনোদিন। সরকার সাহেব জানেন, সব বোঝেন, তিনি মনিরার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন। দৃষ্টির মাধ্যমে চলে তাদের বাক্য বিনিময়।

সরকার সাহেব নীরবে সরে যান।

মনিরা নিজের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রোদন করে।

নূর যখন বাইরে যায় তখন সরকার সাহেব পা টিপে টিপে প্রবেশ করেন মনিরার কক্ষে। তিনি তাকিয়ে দেখেন মনিরা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। সরকার সাহেব আলগোছে এসে বসেন মনিরার পাশে, মাথায় হাত রাখতেই মনিরা উচ্ছসিতভাবে কেঁদে উঠে—চাচাজান, আর কত সইবো বলুন? আর যে পারি না আমি.....

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলেন সরকার সাহেব—কেঁদোনা মা, কেঁদোনা। একে বেগম সাহেবার এ অবস্থা, আর তুমি যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়ো মা, তাহলে নূরের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?

কিন্তু কি করবো সরকার চাচা, আজ মা মৃত্যুশয্যায়, আর তাঁরই পুত্র কিনা নরহত্যা করে বেড়াচ্ছে। একটুও কি মায়াদয়া কিচ্ছু নেই তার? এত হৃদয়হীন পশুর চেয়েও অধম সে...

ছিঃ মা, ও কথা বলোনা, মুনির বাবা অন্যায়ভাবে কোনো দিন নরহত্যা করেনা, করতে পারে না সে। নিশ্চয়ই যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা পাপী...

সরকার চাচা, আপনি জানেন না যাদের হত্যা করা হয়েছে তাঁরা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। এমন কোনো কাজ করেননি তাঁরা যার জন্য তাঁদের হত্যা করা হলো?....

ও তুমি বুঝবে না মা, নিশ্চয়ই ভিতরে কোনো গভীর রহস্য আছে যা আমি তুমি বুঝবো না।

এমন সময় নূর আসে সেখানে—আম্মি শুনেছো দস্যু বনহুর আবার মানুষ খুন করেছে। একটি নয়, এক সঙ্গে পাঁচটি।

সরকার সাহেব কিংবা মনিরা কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু উভয়ে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

নূর বলে উঠে আবার—সরকার দাদা, আপনি আম্মিকে বলেছেন বুঝি?

হাঁ দাদু, আমি আগেই তোমার আম্মিকে এ সংবাদটা জানিয়েছি।

আম্মি, কি ভয়ঙ্কর কথা! না জানি দস্যু বনহুর কখন কোন্ মুহূর্তে আমাদের বাড়ি এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করে বসবে। দাদু সে জন্যই বুঝি সব সময় পুলিশ আমাদের বাড়ির আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকে?

হাঁ ভাই, দস্যু বনহুর যেন এ বাড়িতে আসতে না পারে, এ জন্যই পুলিশ এভাবে কড়া পাহারা দেয়। তোমার কোনো ভয় নেই, দস্যু বনহুর আমাদের কারো কোনো ক্ষতি করবে না। যাও ভাই, তুমি পড়াশোনা করোগে, যাও।

নূর লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে যায়।

পাশের কক্ষ থেকে ঝি ফুলির মা ডাক দেয়—আপামনি, বেগম সাহেবা তোমাকে ডাকছেন।

সরকার সাহেব বলেন—যাও মা, বেগম সাহেবার কাছে যাও, তিনি তোমায় ডাকছেন। কিন্তু এসব কথা যেন বেগম সাহেবার কানে না যায়।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো, বললো সে—সরকার চাচা, একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে যেতে হবে, তিনি যেন বিকেলে আসেন।

আচ্ছা মা আচ্ছা, যাবো।

বেরিয়ে যান সরকার সাহেব।

মনিরা শাশুড়ীর ঘরে প্রবেশ করে।

ফুলির মা এতক্ষণ বসে বসে বেগম সাহেবার মাথায় বাতাস করছিলো এবার সে হাতপাখা রেখে উঠে দাঁড়ায়।

মনিরা এসে বলে—মামীমা, এখন কেমন বোধ করছো?

ভাল না মা, ভাল না। এ যাত্রা আর বুঝি বাঁচবো না মনিরা।

ছিঃ অমন কথা বলো না মামীমা, বুকটা আমার জ্বালা করে উঠে। বাপ-মা, মামা সবাই আমাকে ত্যাগ করে গেছে, তুমিও যদি যাও তবে কি নিয়ে বাঁচবো মামীমা? ফুপিয়ে কেঁদে উঠে মনিরা।

মরিয়ম বেগম তীর জীর্ণ হাত খানা তুলে দেন মনিরার মাথায়—কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে। এমনি করে আর কতদিন আমাকে তোরা ধরে রাখতে চাস্। আমি যে হাঁপিয়ে পড়েছি...

মামীমা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠো, নাহলে তোমার সঙ্গে আমিও মরবো।

আবার ঐ কথা? ছিঃ মা ধৈর্য ধর্। নূরকে মানুষ করতে হবে, এ কথা ভুলে যাস্‌নে। মনিরা, তোর যে অনেক কাজ এখনও বাকি। একটু পানি দেতো মা, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

পানি নয়, একটু দুধ খাও মামীমা। তুমি কিছু খেতে চাওনা, না খেলে চলবে কি করে বলো?

জীবনে অনেক খেয়েছি, আর নাই বা খেলাম। তুই আমাকে পানি দে মনিরা।

অগত্যা মনিরা পানির গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে মরিয়ম বেগমের মুখে।

মরিয়ম বেগম এক নিঃশ্বাসে পানির কিছুটা পান করে গেলাস সহ মনিরার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলে—মনিরা, সত্যি করে বল্ তো মা, মনির...আমার মনির এসেছিলো?

বিশ্বাস করো মামীমা, সে এসেছিলো কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবার সময় সে পায়নি। সে যখন এসেছিলো তুমি তখন অজ্ঞান ছিলে...

নিষ্ঠুর আমাকে ঐ অবস্থায় ফেলে যেতে পারলো? একটুও মনে ব্যথা জাগলো না তার?

মামীমার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না মনিরা। কারণ সেদিন সে এসেছিলো এবং কেন সে দ্রুত চলে গেছে, এসব কথা গোপন রাখতে হয়েছে মরিয়ম বেগমের কাছে। যদি তিনি জানতে পারতেন পুলিশ তাঁর সন্তানকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলো তাই সে পালাতে বাধ্য হয়েছে, তাহলে

মরিয়ম বেগম আরও মুষড়ে পড়তেন, হয়তো বা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তাই কথাটা গোপন করতে হয়েছিলো তাঁর কাছে।

মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। স্বামীর মুখখানা ভেসে উঠে চোখের সামনে, যে মুহূর্তে বনহুর বেরিয়ে গিয়েছিলো ঐ মুহূর্তে সে একবার মনিরার মুখে তাকিয়েছিলো—সেই দৃষ্টির কথা এতক্ষণে মনে পড়ে মনিরার। আজ মনিরা কি জবাব দেবে শাশুড়ীর কথায় ভেবে পায় না। কত ব্যথা নিয়ে সেদিন সে চলে গেছে আর কেউ না বুঝলেও বোঝে মনিরা।

❑

রহমান মায়ের অসুখ কেমন হলো, সংবাদ নিয়েছো?

হাঁ সর্দার, কাল গিয়েছিলাম, মায়ের অসুখ আরও বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে রোগী মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছে। যা তিনি চান তাই তাঁকে দিতে হবে, নাহলে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। সর্দার, আপনি জানেন তিনি কি চান, কাকে চান.....

জানি! জানি রহমান কিন্তু কি করবো বলো? তুমি আমাকে একটা উপায় বলে দাও?

সর্দার, আপনি যখন কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তখন আমি কি উপায় বলতে পারি বলুন?

জানি তোমরা আমাকে কোনো পথ বলে দিতে পারবে না। বনহুর পায়চারী করতে লাগলো।

রহমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঐ মুহূর্তে কায়েস প্রবেশ করলো সেখানে, কুর্নিশ জানিয়ে বললো —সর্দার।

থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো বনহুর—বলো?

সর্দার আম্মার অসুখ আজ খুব বেড়েছে।

বনহুর তাকালো রহমানের দিকে, চোখে তার প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

রহমান বললো—সর্দার; আমি সেখানে কায়েসকে রেখে এসেছিলাম, কারণ বেগম সাহেবা কখন কেমন হন যেন সে সংবাদ নিয়ে আসে।

বনহুর বলে উঠে—কায়েস, তুমি কি রাতে চৌধুরী বাড়ি ছিলে?

হাঁ সর্দার। চাকর আবদুলের বড় ভাইয়ের বেশে আমি চৌধুরী বাড়িতে ছিলাম। শেষ রাত থেকে বেগম সাহেবার অসুখ ভয়ানক বেড়ে গেছে।

ডাক্তার দেখছেন?

হাঁ, সব সময় দু'জন ডাক্তার বেগম সাহেবার পাশে আছেন।

রাতে কোন্ ডাক্তার ছিলেন?

রাতে ডাক্তার হুসাইন ছিলেন এবং তিনি সকাল অবধি ছিলেন আমি দেখে এসেছি।

বনহুর এসে তার শয্যায় বসলো; তারপর একটু ভেবে বললো—আচ্ছা, তুমি যাও কায়েস, বিশ্রাম করোগে।

কায়েস চলে গেলো।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—তাজকে প্রস্তুত রেখো, সন্ধ্যার পর আমি কান্দাই রওয়না দেবো।

সর্দার, চৌধুরী বাড়িতে যাবেন?

দেখি কতদূর কি করতে পারি। মাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়, তার মুখমন্ডলে ব্যথা-বেদনা আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে।

নূরী একটা গেলাসে দুধ নিয়ে প্রবেশ করে সেখানে।

বনহুর পাশের টেবিলে দুধের গেলাস রেখে বলে—হুর, তুমি কাল রাতে কিছু খাওনি, ওঠো দেখি দুধটুকু খেয়ে নাও।

বনহুর বলে—খিদে নেই নূরী।

জানি কোনো সময় তোমার খিদে পাবে না। নাও, এবার দুধটুকু খাও দেখি। নূরী দুধের গেলাস তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

বাধ্য হয়ে দুধটুকু খায় বনহুর, তারপর হাতের পিঠে মুখ মুছে বলে—নূরী, আজ মায়ের অসুখ বেশি হয়েছে।

ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে নূরী—রহমানের কাছে সব শুনেছি। হুর, জানি তোমার জন্য আজ মায়ের এ অসুখ, কিন্তু...

নূরী, মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি বাঁচবো না, আমি বাঁচবো না নূরী।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে বলে—হুর, তুমি অধৈর্য হচ্ছো কেন? মা নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন। আমার মন বলছে, মা সেরে উঠবেন।

সত্যি তোমার মন বলছে আমার মা বাঁচবে? বলো, বলো, নূরী? বনহুর নূরীর হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো।

বললো নূরী—হাঁ হাঁ হুর, তুমি দেখো আমার কথা সত্য হবে।

কিন্তু মার যে অসুখ বেশি হয়েছে নূরী? মা আমাকে অনেকদিন দেখেননি তাই তিনি আমাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। নূরী আমি যাবো, মাকে দেখতে যাবো মনস্থ করেছি।

হুর, তুমি কি পাগল হয়েছো? চৌধুরী বাড়ির চারপাশে অস্ত্রের বেড়াজালে ঘিরে রেখেছে কান্দাই পুলিশ বাহিনী। ওরা তোমাকে জীবিত কিংবা মৃত গ্রেপ্তার করবে।

এ কথা আজ নতুন নয় নূরী। কান্দাই পুলিশ বাহিনী এ প্রচেষ্টা এক যুগ থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

তুমি যেওনা হুর।

নূরী, আমি না গেলে মা বাঁচবে না। মা যে আমাকে কাছে পেতে চায়।

কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার কোনো অমঙ্গল হয়?

একটু হেসে বলে বনহুর—তোমার মুখে একথা শোভা পায় না নূরী। তাজকে প্রস্তুত করতে বলেছি, আজই আমি কান্দাই রওয়ানা দেবো।

হুর, তুমি চৌধুরী বাড়ি যাবে তাহলে?

না হলে উপায় কি বলো? তবে প্রথমে ডাঃ হুসাইনের কাছে যাবো, তিনি কি বলেন...যদি জানতে পারি মা একটু সুস্থ তাহলে আপাততঃ যাওয়া বন্ধ রাখবো।

সত্যি তুমি যাবে না তো?

না, যদি মার অসুখ সম্বন্ধে ভাল সংবাদ পাই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে এলো। বনহুর নূরীর কাছে বিদায় নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসলো।

ঘন্টা দু'য়ের মধ্যে তাজ পৌঁছে গেলো কান্দাই শহরে।

ডাক্তার হুসাইনের বাড়ির অদূরে এসে তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারদিক।

আকাশে মিট মিট করে কয়েকটা তারা জ্বলছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, ডাক্তার হুসাইনের বাড়ির দ্বিতলে একটি কক্ষে আলো জ্বলছে। বনহুর জানতো, ডাক্তার হুসাইন এই কক্ষেই রাতে ঘুমান। আরও জনোতো সে, ডাক্তার রাত ধরে ডাক্তারী বই নিয়ে পড়াশোনা করেন। কান্দাই শহরে তাঁর নামডাক অত্যন্ত ভাল ছিলো, রোগীর সংখ্যা ছিলো প্রচুর। নানা ধরনের রোগির সমাবেশ ঘটতো তাঁর কাছে, কাজেই তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো বেশি।

বনহুর প্রাচীর বেয়ে উঠে এলো দেয়ালের পাশে। একটা বিরাট ঝিম্‌সা গাছ ছিলো দেয়ালের ধারে, ঐ ঝিম্‌সা গাছ বেয়ে উঠে চললো।

ঝিম্‌সা গাছ আমাদের দেশের পাইন গাছের মত লম্বা। এতে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না। ডাক্তার হুসাইন এই ঝিম্‌সা গাছটা সখ করে তাঁর শয়নকক্ষের ধারে লাগিয়েছিলেন। ঝিম্‌সা ফুলের গন্ধ অতি মধুর।

বনহুর ঝিম্‌সা গাছ বেয়ে উঠে এলো দ্বিতলে।

ডাক্তার হুসাইন সবেমাত্র সার্জারী বইখানা বন্ধ করে উঠতে যাবেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর জানালা দিয়ে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকান ডাক্তার হুসাইন। জমকালো পোশাক পরা বনহুরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেন তিনি, বলেন—কে? কে তুমি?

এগিয়ে আসে বনহুর এবং শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলেন—আমি! আমি দস্যু বনহুর।

তুমি! কি চাও আমার কাছে?

মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন ডাক্তার। আমি আপনার কাছে কিছু নিতে আসিনি, এসেছি আমার মায়ের সম্বন্ধে জানতে। বসুন ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার হুসাইনের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এতদিন তিনি দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে নানা কথাই শুনে এসেছেন। যদিও তিনি এখন চৌধুরী বাড়ির ডাক্তার কিন্তু দস্যু বনহুরকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি কোনোদিন।

দস্যু বনহুরের মুখে পাগড়ীর আঁচল জড়ানো ছিলো না, তাই ডাক্তার হুসাইন অবাক হয়ে দেখেছেন। এত সুন্দর চেহারার লোক তিনি কোনোদিন দেখছেন কিনা স্মরণ নেই।

ডাক্তার হুসাইনকে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে বলে বনহুর—দেখুন আমি আপনার সন্তানের মত। যদিও আমি দস্যু কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অমঙ্গল হবে না আমার দ্বারা আপনার। আমার মা অসুস্থ কিন্তু তাঁকে আমি দেখতে যেতে পারি না। তাই এসেছি তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে সংবাদ নিতে। একটু থেমে বলে বনহুর—ডাক্তার, বলুন আমার মা কেমন আছেন? তাঁর অবস্থা এখন কেমন? বলুন ডাক্তার?

বনহুরের ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তার হুসাইনের মন ব্যথায় জর্জরিত হলো, তিনি বললেন—এতদিন তোমাকে কল্পনার চোখে দেখেছিলাম। কল্পনায় চিন্তা করতাম তোমাকে, আজ তোমাকে স্বচক্ষে দেখলাম... অপূর্ব, অপূর্ব তুমি দস্যু বনহুর।

বনহুর ডাক্তার হুসাইনের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—ডাক্তার, মায়ের কথা বলুন? আমার মা বাঁচবেন তো।

এতক্ষণে যেন ডাক্তার হুসাইনের সম্বিৎ ফিরে আসে, তিনি বলেন —হাঁ, তোমার মা অসুস্থ কিন্তু...

বলুন...বলুন ডাক্তার, থামলেন কেন বলুন?

তোমার মার অসুখ মানসিক দুশ্চিন্তা, এই দুশ্চিন্তা দূর না হলে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন না।

দুশ্চিন্তা। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বনহুর, তারপর বললো —ডাক্তার, আপনি বলুন কি করে আমার মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করবো? বলুন ডাক্তার?

এক দুর্ধর্ষ দস্যুকে তার মায়ের জন্য এমনভাবে বিচলিত হতে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন ডাক্তার হুসাইন। তিনি জানতেন, দস্যু ডাকুদের মন স্বাভাবিক মানুষের মত হয় না, এরা প্রায়ই হৃদয়হীন হয় কিন্তু ঠিক তার বিপরীত দস্যু বনহুর। ডাঃ হুসাইন অবাক হয়ে গেছেন। শুধু অবাক নয়— অভিভূত-বিস্মিত, বলেন তিনি—আমি জানি, তোমার মা শুধু তোমার জন্য আজ এমন অসুস্থ। এবার আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, তোমার মা আরোগ্য লাভ করবেন।

সত্যি? সত্যি ডাক্তার?

হাঁ,..কারণ তোমাকে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। এতদিন আমি তাঁর শুধু চিকিৎসাই করে এসেছি তাঁকে কোনোরকম সান্তনা দিতে পারিনি। আমার চিকিৎসা করা কর্তব্য, তাই করে গেছি কিন্তু তাঁর আসল অসুখের ওষুধ দিতে পারিনি।

ডাক্তার, আমার মাকে আপনি আরোগ্য করুন। যা চাইবেন তাই দেবো। টাকা-পয়সা লোভ দেখিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাইনা আমি....

আচ্ছা, তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখো, আমি যতটুকু পারবো তাঁকে আরোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবো।

অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার অনেক ধন্যবাদ। বনহুর যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে যায়।

❑

মিঃ হেলালী নিজের শয়নকক্ষে সম্মুখস্থ বেলকুনিতে বসে সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চলেছেন। তাঁর সম্মুখে সীমাহীন মুক্ত আকাশ। মিঃ হেলালীর দৃষ্টি ঐ জমকালো আকাশের দিকে। আজ আকাশে একটি তারাও নেই।

কেমন যেন একটা থমথমে ভাব সারা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সন্ধ্যায় এক পশ্‌লা বৃষ্টিও হয়ে গেছে!

এখনও পাতায় পাতায় জমে আছে বৃষ্টির কণা। মাঝে মাঝে শোকাতুরা জননীর দীর্ঘশ্বাসের মত হাওয়া বইছে। টুপটাপ করে পড়ছে পাতা থেকে বৃষ্টির কণাগুলো ভিজে চপচপে মাটির উপর।

মিঃ হেলালী ভাবছেন গত পরশুর সেই প্যাকেট করা লাশগুলোর কথা। কিভাবে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে সুন্দরভাবে লাশগুলোকে কাঠের বাক্সে প্যাকেট করে পাঠানো হয়েছে। বাক্স না খোলা পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারেনি তাতে কি আছে। একটি নয়, পাঁচ পাঁচটি লাশ—কান্দাই শহরের স্বনামধন্য ধনকুবের ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের মৃতদেহ। দস্যু বনহুর তাদের পিস্তলের গুলি বা ছোরা দ্বারা নিহত করেনি। হত্যা করেছে অগ্নিদগ্ধ পেরেক দ্বারা। অদ্ভুত এ হত্যালীলা। কিন্তু কেন দস্যু বনহুর তাদের অস্ত্রের দ্বারা হত্যা না করে এভাবে অদ্ভুত উপায়ে হত্যা করলো? নিশ্চয়ই এমন কোনো রহস্য আছে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি বা পারবে না। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দীর্ঘ কয়েক বছরের রিপোর্ট পাঠ করে জানা যায়, যতগুলো হত্যা দস্যু বনহুরের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, সবাই ধনকুবের, বিত্তশালী এবং বেশির ভাগ ব্যবসায়ী।

কান্দাই আসার পর থেকে হেলালী অবিরত পরিশ্রম করে চলেছেন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তাঁর মনে নানারকম প্রশ্ন সদা-সর্বদা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে—দস্যু বনহুরকে কান্দাইবাসী কেমন চোখে দেখে...তাঁর সম্বন্ধে দেশবাসীর কি ধারণা...শুধু কি দস্যু বনহুরকে দেশবাসী ভয়ই করে, না তাকে ভালওবাসে।

দস্যু বনহুর সম্বন্ধ নানাজনের কাছে নানারকম কথা শুনেছেন। মিঃ জাফরীর নিকটে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যদিও সবকিছু মিঃ হেলালী অবগত হয়েছিলেন তবু তিনি গোপনে জনসাধারণের মধ্যে মিশে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। দেশের জনগণের মধ্যে দস্যু বনহুর ভয়ঙ্কর এক দস্যু হলেও সবাই তাকে মনে মনে ভালবাসে, এটাও তিনি উপলব্ধি করলেন। বিশেষ করে দস্যু বনহুর ধনবান সমাজের আতঙ্ক এং চিরদুঃখী অসহায় যারা, তাদের বন্ধুজন বলেই তিনি প্রমাণ পেলেন।

মিঃ হেলালী ভাবছেন অদ্ভুত এ দস্যু বনহুর, যার কার্যকলাপ সব কিছুই অদ্ভুত। শুধু সে নর হত্যাকারীই নয়, শত শত মরণমুখী মানুষের জীবনরক্ষকও হঠাৎ কক্ষমধ্যে টেলিফোনটা বেজে উঠে, মিঃ হেলালীর চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে উঠে গেলেন এবং রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো মিঃ ইয়াসিনের কম্পিত কণ্ঠ.....হ্যালো, আমি ইন্সপেক্টার ইয়াসিন বলছি.....আমার কক্ষের দেয়ালে একটা খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে.....কক্ষে আমি একা.....আমার কেমন ভয় করছে...

মিঃ হেলালীর মুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো, তিনি ব্যস্ত গলায় বললেন—মিঃ ইয়াসিন, আপনার কক্ষের দেয়ালে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে.... কেন পাহারাদারগণ...পাহারারত নেই কি...আপনি শিগ্‌গির তাদের সজাগ হবার জন্য জানিয়ে দিন...

মিঃ ইয়াসিনের গলা শোনা গেলো...পাহারারত পুলিশদের কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছি না...হ্যালো আমি...আমি...আ...মি...কে...কে... তুমি...

চমকে উঠলেন মিঃ হেলালী, মিঃ ইয়াসিনের গলা যেন আচম্বিতে থেমে গেলো। রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই মিঃ ইয়াসিনের কক্ষে এমন কেউ প্রবেশ করেছে যাকে দেখাবামাত্র তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো এবং ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন, কে...কে...তুমি...দস্যু বনহুর নয় তো? নিজের মনকেই প্রশ্ন করেন মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়েল করেন মিঃ জাফরীর কাছে।

মিঃ জাফরী সুখ নিদ্রায় বিভোর ছিলেন, যদিও তাঁর সুখনিদ্রার সময়কাল এখন নয় তবু সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে দু'চোখে নেমে এসেছিলো ঘুমের আমেজ।

টেবিলে ফোন বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেন মিঃ জাফরী, বিছানা তেকেই হাত বাড়িয়ে তিনি রিসিভার তুলে নেন হাতে, তারপর বলেন—হ্যালো...

অমনি ওপাশে থেকে ভেসে আসে মিঃ হেলালীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, আমি হেলালী বলছি...হ্যালো মিঃ জাফরী, মিঃ ইয়াসিন এই মুহূর্তে আমার কাছে ফোন করেছিলেন কে তার কক্ষে প্রবেশ করেছে... জানিনা কে সে লোক...যার আগমনে মিঃ ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিলো...ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম স্যার...

মিঃ জাফরীর চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেলো, মুহূর্তে তিনি বিছানা থেকে তড়িৎগতিতে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেতে। তারপর রিসিভার ভালভাবে এঁটে ধরে বললেন...এই মুহূর্তে মিঃ ইয়াসিন আপনাকে ফোন করেছিলেন...

...হাঁ স্যার, এই মুহূর্ত আমি তাঁর ফোন পেয়েছি.....হঠাৎ লাইন কেটে গেলো...স্যার.....নিশ্চয়ই মিঃ ইয়াসিন বিপদগ্রস্ত হয়েছেন...

মিঃ জাফরী বলে উঠেন...তাহলে এক মুহূর্ত আর বিলম্ব করা উচিত নয়...আপনি প্রস্তুত থাকুন, এক্ষুণি আমি মিঃ ইয়াসিনের ওখানে যাবার জন্য রওয়ানা দিচ্ছি...আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো....

...আচ্ছা আপনি আসুন...

মিঃ হেলালী রিসিভার রেখে আলনা থেকে ওভারকোটটা টেনে নিয়ে গায়ে পরে নেন, তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে নেয় রিভলভারখানা। পুনরায় রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ডায়াল করেন, এবার মিঃ জাফরী বা অন্য কোন পুলিশ অফিসারের কাছে নয়, একেবারে মিঃ ইয়াসিনের কাছে। ...হ্যালো...হ্যালো...ও পাশে রিং হবার শব্দ ভেসে আসেছে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। মিঃ ইয়াসিন কি করছেন তার কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছে না কেন। ফোন কেউ ধরছে না ব্যাপার কি।

এমন সময় নিচে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী বুঝতে পারলেন মিঃ জাফরী এসেছেন, তিনি বিলম্ব না করে সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন তর তর করে।

মিঃ জাফরী এবং দুজন পুলিশ গাড়িতে রয়েছে।

মিঃ হেলালী গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই পুলিশদ্বয় নেমে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী চেপে বসতেই পুলিশদ্বয় উঠে বসলো—গাড়ি ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ জাফরী সহ মিঃ হেলাল পৌঁছে গেলেন মিঃ ইয়াসিনের বাড়ির গেটে।

গেটে পৌঁছতেই গেটের পাহারাদার সেলুট জানিয়ে গেট খুলে দিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—এরা দেখছি ঠিকমতই পাহারা দিচ্ছে। মিঃ জাফরী এবার গেটে পাহারারত পাহারাদারকে বললেন—বাড়ির আশেপাশে এবং পিছন অংশে যে সব পুলিশ পাহারা দিচ্ছিলো তারা কি সব ঠিক ঠিক জায়গায় পাহারারত আছে?

হ্যাঁর স্যার, আছে।

এগিয়ে এলেন মিঃ হারুন, তিনিই আজ রাতে ইনচার্জ ছিলেন মিঃ ইয়াসিনের বাড়ির জন্য। তিনি এসে সেলুট করে বললো—সবাই ঠিকমত কাজ করছে স্যার।

মিঃ জাফরী বললেন—এইমাত্র আমরা মিঃ ইয়াসিনের ফোন পেয়েছি, কক্ষে কেউ প্রবেশ করেছিলো বলে মনে হলো....

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে উঠে মিঃ হারুনের মুখমন্ডল, যদিও অন্ধকারে তাঁর মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু বোঝা যায় তিনি এ সংবাদ শোনামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। কারণ তাঁরা তো সব সময় সজাগভাবে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন। বললেন মিঃ হারুন—স্যার কি বলছেন?

হাঁ মিঃ হারুন, আমরা মিঃ ইয়াসিনের ফোন পেয়েই ছুটে আসছি। জানি না কি ঘটেছে। কথাগুলো বলে মিঃ হেলালী বললেন—চলুন স্যার, দেখা যাক্ মিঃ ইয়াসিন কেমন আছেন?

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে গাড়ি ভিতরে নেবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই দু'জন প্রহরারত পুলিশ সেলুট করলো।

মি হেলালী এবং মিঃ জাফরী নেমে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ হেলালী, আপনি উপরে যান, আমি বাড়িটার পিছন অংশ পরীক্ষা করে আসছি—কারণ, আমাদের আগমনে কেউ নে পিছন দিক দিয়ে সরে না পড়তে পারে।

মিঃ হেলালী অগ্রসর হতেই তার সংগে দু'জন পুলিশও চললো।

সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা এগুতেই সিঁড়ির মুখে একজন পাহারারত পুলিশ সেলুট করলো মিঃ হেলালীকে।

মিঃ হেলালী মাথা দোলালেন, তারপর পুলিশটির পাশ কেটে চলে গেলেন সিড়ি বেয়ে উপরে।

কিছুটা এগুতেই মিঃ ইয়াসিনের কক্ষে কেমন একটা ছট্‌ফটের শব্দ কানে এলো।

ওদিকে তখন পুলিশটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে। গাড়ি বারান্দায় মিঃ জাফরীর গাড়িতে ড্রাইভার বসেছিলো।

পাহারারত পুলিশটি গাড়ির পাশে এসে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসে বললো—শিগ্‌গির পুলিশ অফিসে চলো। বিশেষ প্রয়োজনে পুলিশ সুপার আমাকে অফিসে যেতে বললেন। এখনি কাজ করে ফিরে আসবো।

ড্রাইভার মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি ছাড়লো।

গেটের পাহারাদার দু'জন গেট খুলে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ি বেরিয়ে গেলো উল্‌কা বেগে।

মিঃ জাফরী তখন পিছন অংশ থেকে সম্মুখে এগিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ গাড়ি বেরিয়ে গেলো কেন বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গী পুলিশদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন।

পুলিশদ্বয় কোনো জবাব দিতে পারলো না।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশদ্বয় গাড়ি বারান্দায় এসে দেখলেন তাঁদেরই গাড়ি বেরিয়ে গেছে। কে গাড়িতে গেলো আর কেনই বা গেলো মিঃ জাফরী বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, মিঃ হেলালী এ ব্যাপার নিশ্চয়ই জানেন। হয়তো তিনিই পাঠিয়েছেন কাউকে কোনো কারণে।

সিড়ি বেড়ে উঠে গেলেন উপরে কিন্তু সিঁড়ির মুখে না যেতেই এক জন পুলিশ দ্রুত ছুটে আসছিলো। সে মিঃ জাফরীকে সম্মুখে দেখতে পেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো—স্যার খুন...মিঃ ইয়াসিন খুন হয়েছে...

মিঃ জাফরী ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে পড়লেন। মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ মহল নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিলো। সব তাহলে ব্যর্থ হলো? মিঃ জাফরী কোনো কথা না বলে দ্রুত এগুলেন মিঃ ইয়াসিনের কামরার দিকে।

মিঃ ইয়াসিনের কামরায় প্রবেশ করে দেখলেন মিঃ ইয়াসিন মেঝের কার্পেটে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার বুকে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা গাঁথা। ছোরার সমস্ত অংশই প্রবেশ করেছে মিঃ ইয়াসিনের বুকের মধ্যে শুধু ছোরার বাটখানা উঁচু হয়ে আছে।

তাজা রক্তে ভিজে উঠেছে কার্পেটের কিছু অংশ। এখনও তাজা রক্ত ফিনকী দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মিঃ ইয়াসিনের বুক থেকে।

মিঃ জাফরী যেন মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তিনি নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন—মিঃ ইয়াছিনের মৃত দেহের দিকে।

মিঃ ইয়াছিনের প্রাণ-বায়ু হয়তো কয়েক মিনিট পূর্বে বেরিয়ে গেছে। তার চোখ দুটো অর্দ্ধমেলিত অবস্থায় রয়েছে। মুখখানা বিকৃত রক্তশূন্য।

কক্ষ মধ্যে সবাই নীরব।

সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মিঃ ইয়াসিন কিছুদিন হলো এই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। সদাসর্বদা প্রহরা অবস্থায় তাঁকে থাকতে হবে এসব কারণেই তিনি নিজ বাড়ি ত্যাগ করে এ বাড়িতে এসেছিলেন। এ বাড়িতে সাধারণ লোকজনের আনাগোনা নিষেধ ছিলো। বাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিলো। এতো সত্যেও মিঃ ইয়াসিন দস্যু বনহুরের কবল থেকে বাঁচতে পারলেন না।

মিঃ হেলালী হাটু গেড়ে বসে ভালভাবে দেখছিলেন, এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দস্যু বনহুর তার শপথ রক্ষা করেছে...

মিঃ জাফরীর যেন সম্বিত ফিরে এলো, তিনি বললেন—হাঁ মিঃ হেলালী আমাদের সব চেষ্টাই এই দুর্ধর্ষ দস্যু বার বার নস্যাৎ করে দিয়েছে। দস্যু বনহুর মিঃ ইয়াসিনকে হত্যা করে তবেই ছাড়লো।

মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই এই বাড়ির কোন অংশে আত্মগোপন করে আছে স্যার। কারণ মিঃ ইয়াসিনকে বেশিক্ষণ হলো খুন করা হয়নি।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—মিঃ হেলালী আপনি দস্যু বনহুরকে ভালভাবে জানার সুযোগ এখনও পাননি—তাই এ কথা বলছেন। দস্যু বনহুর আমার গাড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে চলে গেলো...

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো মিঃ হেলালী—দস্যু বনহুর আপনার গাড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে চলে গেলো বলেন কি-স্যার?

হাঁ মিঃ হেলালী?

আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য নয় মিঃ হেলালী, শুধু আশ্চর্য নয় চরম বিস্ময়। এতো বড় দুর্ধর্ষ শয়তান—দস্যু বনহুর যেন আমাদের এতোগুলোর চোখে ফাঁকি দিয়ে পলিয়ে যেতে সক্ষম হলো একেবারে কল্পনাতীত।

স্যার দস্যু বনহুর শুধু দুর্ধর্ষ নয় তার মত সুচতুর বুদ্ধিমান বুঝি আর দ্বিতীয় হন নাই। তার শপথ রক্ষা করে সে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলো অথচ আমরা সেখানেই উপস্থিত ছিলাম।

মিঃ জাফরী সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে এবং অন্যান্য পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করলেন, দস্যু বনহুর মিঃ ইয়াছিনকে হত্যা করে পুলিশ সুপারের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

সমস্ত শহর তখন ঘুমে অচেতন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি খানা উল্‌কা বেগে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস অভিমুখে ছুটে চলেছে।

জনশূন্য রাজপথ।

এক একটা জাগ্রত প্রহরীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইট পোষ্টগুলো।

গাড়িখানা যখন লাইট পোষ্টের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন লাইট পোষ্টের আলো এসে পড়ছিলো বনহুরের মুখে! পুলিশের ড্রেসে তাকে মানিয়েছে ভাল। দৃষ্টি তার গাড়ির সম্মুখে, কোন একটি মুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষা করছে সে।

গাড়িখানা গ্রীন হাউসের নিকটর্তী হতেই বনহুর পকেট থেকে দ্রুত রিভলভার বের করে চেপে ধরলো ড্রাইভারের পিঠে—গাড়ি রোখো।

চমকে উঠলো ড্রাইভার, সে এক মনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো— তার গন্তব্য স্থান পুলিশ হেড অফিস কিন্তু হঠাৎ গাড়ি রাখার নির্দেশ এলো পিছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে পিঠে শক্ত এবং ঠান্ডা কোন একটি বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো ড্রাইভার।

ব্রেক কষে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেললো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।

গিয়ে বলো—দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে।

দু'চোখ ছানা বড়া করে ঢোক গিললো ড্রাইভার—দস্যু বনহুরকে এতোক্ষণ ড্রাইভ করে নিয়ে এলো। কি ভয়ঙ্কর এবং আশ্চর্য কথা। ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

বনহুর দ্রুত গ্রীন হাউসের দিকে চলে গেলো।

ড্রাইভার অগত্যা গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চললো—যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে।

মিঃ জাফরী এবং হেলালী তখন মিঃ ইয়াসিনের লাশ পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

ছোরাখানা টেনে তুলে নিলেন মিঃ জাফরী।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একজন পুলিশ ব্যস্তভাবে এসে বললেন—স্যার আপনার গাড়ি ফিরে এসেছে।

গাড়ি ফিরে এসেছে! কথাটা উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হেলালীও বিস্ময় নিয়ে তাকালো পুলিশটার মুখে।

মিঃ জাফরী বললেন—ড্রাইভার একা ফিরে এসেছে?

হাঁ স্যার।

তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঐ দণ্ডে আর একজন পুলিশ এসে জানালো—স্যার সিড়ির নিচে আমাদের একজন পাহারাত পুলিশ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। চলুন স্যার দেখবেন চলুন।

মিঃ জাফরী দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—শয়তানটা দেখুন কিভাবে চাতুরী খেলেছে। পাহারারত পুলিশকে বন্দী করে তার ড্রেস নিয়ে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমারই গাড়ি নিয়ে পালালো অথচ আমরা সবাই.....

কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার আমরা সবাই বেকুফ বনে গেলাম।

এক সময় একজন পুলিশ হঠাৎ বলে উঠলো—হুজুর মিঃ ইয়াসিন সাহেবের হাতের মুঠায় কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হেলালীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নিহত মিঃ ইয়াসিনের হাতের মুঠায়। মনে হলো তার হাতের মধ্যে এক টুকরা কাগজ রয়েছে।

মিঃ হেলালী কাগজের টুকরাখানা বের করে নিলেন মিঃ ইয়াসিনের হাতের মুঠো থেকে। মেলে ধরনের তিনি তারপর পড়লেন—

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম তাই
তার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করলাম।

ইয়াসিন হক

মিঃ জাফরী কাগজের টুকরাখানার উপর ঝুকে দেখে নিয়ে বললেন—এটা দেখছি মিঃ ইয়াসিনেরই হাতের লেখা।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার দস্যু বনহুর তাঁকে হত্যা করবার পূর্বে তারই দ্বারা এ কাগজখানা তাঁকে লিখতে বাধ্য করেছিলো।

হাঁ তাই তো দেখছি, মিঃ ইয়াছিন দ্বারা এই চিরকুট্‌খানা লিখে নেওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কথাগুলো বলে মিঃ জাফরী পুনরায় চিরকুটখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

ততক্ষণে মিঃ জাফরীর গাড়ির ড্রাইভারসহ পুলিশটি উপরে উঠে এলো। ড্রাইভারের চোখে মুখে ভীত আতঙ্কভরা ভাব। সেলুট করলো সে মিঃ জাফরী ও মিঃ হেলালীকে।

মিঃ জাফরী কঠিন কণ্ঠে বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

স্যার আমি কিচ্ছু জানিনা। আমি কিচ্ছু জানি না স্যার দস্যু বনহুর আমাকে.....

বলো থামলে কেনো?

স্যার ঐ পুলিশটা যে দস্যু বনহুর তা আমি বুঝতে পারিনি স্যার। আমাকে বললো—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যেত হবে চলো।

তুমি তাই নিয়ে গেলে না।

হাঁ স্যার।

আমি কি তোমায় সে রকম কিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম?

না স্যার।

তবে গেলে কেনো জবাব দাও?

তখন এতো কিছু ভাবতে পারিনি। আমাকে মাফ্ করে দিন স্যার। আমি ভেবেছিলাম হয়তো আপনি বা মিঃ হেলালী তাকে পুলিশ অফিসে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তাই.....

তাই তুমি আমার বিনা অনুমতিতে যা খুশি তাই করবে।

হুজুর।

দস্যু বনহুরকে কোথায় রেখে এলে?

হুজুর গ্রীন হাউসে সে নেমে গেছে।

মিঃ হেলালী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—গ্রীন হাউসে?

হঁ স্যার।

মিঃ হেলালী এবং মিঃ জাফরী উভয়ে তাকালেন উভয়ের মুখে। বললেন মিঃ জাফরী—গ্রীন হাউসে তাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি ফিরে এলে?

হাঁ দস্যু বনহুর নিজে বললেন—তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। গিয়ে বললো দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে...

মিঃ জাফরী বললেন—স্পর্দ্ধ দেখুন।

মিঃ হেলালী বললেন—স্যার স্পর্দ্ধা নয় তার দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় এটা। যাক্ এবার কি করা যায় বলুন? যা ঘটে গেছে তার আর কোন উপায় নেই। মিঃ ইয়াসিনকে আর বাঁচানো গেলো না। এবার লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে চলুন।

ড্রাইভার বলে উঠে—স্যার দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে আপনারা যদি তাড়াতাড়ি করেন তাহলে...

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন মিঃ হেলালী—দস্যু বনহুর গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য বলো কি ড্রাইভার?

হ্যাঁ স্যার।

দস্যু বনহুর নির্বোধ নয় যে সে আমাদের জন্য গ্রীন হাউসে অপেক্ষা করবে।

মিঃ ইয়াসিনের মৃত দেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে চললেন—জাদরেল পুলিশদ্বয়। এতো সাবধানতা সত্ত্বেও এ দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। কেউ পারলো না মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা করতে।

পরদিন সমস্ত শহরে ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়লো।

এক সপ্তাহ পূর্বে মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীগণের হত্যাকান্ড কান্দাইবাসীকে ভীত আতঙ্কিত করে তুলেছিলো। পুনরায় মিঃ ইয়াসিনের বিস্ময়কর হত্যা মানুষকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুললো।

মিঃ জাফরী গম্ভীর হয়ে পড়লেন। দস্যু বনহুরের কাছে পুলিশ মহলের কাছে বার বার চরম পরাজয় শুধু লজ্জাকর নয় বিরাট ব্যর্থতার পরিচয়।

মিঃ হেলালী সেই দিনই দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ফেললেন। এই কমিটির কাজ হলো শুধু দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে সূক্ষ্ম গবেষণা চালানো।

মিঃ হেলালী কয়েকজন দক্ষ পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দা বিভাগীয় অফিসারদের নিয়ে কান্দাই জেলা প্রশাসকের অফিসে বসে আলোচনা করলেন। আলোচনার মূল বিষয় বস্তু হলো পুলিশ মহলের এতো সাবধানতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর তার কাজ নীরবে চালিয়ে চলেছে। কি করে আর কেমন ভাবে এই দস্যুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে এই নিয়েই তর্ক বির্তক শলা পরামর্শ চললো।

আলোচনা শেষ হতে প্রায় রাত অনেক হয়েছিলো। মিঃ হেলালী যখন বাংলোয় ফিরলেন তখন রাত দু'টো বেজে গেছে।

বাংলোয় মিঃ হেলালী বয় বাবুর্চি দারওয়ান এবং গুটি কয়েক প্রহরারত পুলিশ ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। তিনি এখনও অবিবাহিত। কাজেই অন্য কোন ঝামেলা নাই।

মিঃ হেলালী এ জন্যই সচ্ছন্দে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার অভিযান চালানো ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। দেশে বাবা মা এবং ছোট ছোট ভাই-বোন আছে। তারা মিঃ হেলালীর উপার্জনেরই মুখাপেক্ষী।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মিঃ হেলালী। পিতা এখন উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ কাজেই মিঃ হেলালীকেই তার সব কিছু খরচ পত্র বহন করতে হয়, এসব কারণেই মিঃ হেলালী আজও বিয়ে করেন নাই।

পিতা-মাতা ভাই-বোন সবাই দেশে কাজেই বনহুর গ্রেপ্তার ব্যাপারে মিঃ হেলালীকে বাধা দেবার কেউ ছিলো না। তবে মিঃ হেলালী স্বার্থহীন অন্যায় বিরোধী মানুষ। যদিও পুলিশের চাকরিতে তার খুব একটা ইচ্ছা ছিলো না তবু তিনি কতকটা বাধ্য হয়েই এ চাকরি গ্রহণ করেছিলেন পিতা-মাতা ভাই-বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ মিঃ হেলালী দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করলেও তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে নয় নেশা এবং জেদের বশবর্তী হয়ে, এ অভিযানে আত্ম নিয়োগ করেছেন।

মিঃ হেলালীর গাড়ি বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

বাংলোর সম্মুখে গাড়ি থামতেই ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মিঃ হেলালী নেমে গাড়ি থেকে বাংলোর ভিতরে চলে গেলেন।

রাত দুটো।

কাজেই মিঃ হেলালী তাড়াতাড়ি তাঁর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে জামা কাপড় পাল্‌টে নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

বাথরুম থেকে বেরুতেই বয় একটা চিঠি টেবিলে রেখে বললো —স্যার ড্রাইভার চলে যাবার সময় এটা আপনাকে দিতে বলে গেলেন।

মিঃ হেলালী তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ পরিস্কার করে মুছে নিয়ে বিছানায় বসলেন তারপর টেবিলে ঢাকা দেওয়া ঠান্ডা পানি এক নিঃশ্বাসে পান করে নিয়ে লঘু হস্তে চিঠিখানা তুলে নিলেন হাতে। ভাবলেন নিশ্চয়ই ড্রাইভার কাল ছুটি চাইবে এটা তারই চিঠি।

জেলা প্রশাসকের অফিসেই ডিনার শেষ করে এসেছেন মিঃ হেলালী কাজেই খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা ছিলোনা। যদিও খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়াই ছিলো। মিঃ হেলালী চিঠিখানা ধীরে সুস্থে খাম থেকে বের করে মেলে ধরতেই চমকে সোজা হয়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে শুরু করলেন—"বন্ধুবর মিঃ হেলালী, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে অভিযান যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন সেই ভাবে যদি

দুস্কৃতিকারী নিধন অভিযান চালিয়ে
যাবার জন্য সংগ্রাম করতেন তাহলে
হয়তো দেশের ক্ষুধার্ত জনগণ আজ
বাঁচার আশ্বাস পেতো। মিঃ হেলালী
ড্রাইভ আসনে বসে ভাবছিলাম
আপনার মহৎ মনের কথা। কারণ
এই ক'দিনেই আমি আপনাকে
চিনে নিয়েছি। আপনার মহান
চরিত্রকে আমি অভিনন্দন জানাই।

—দস্যু বনহুর।

চিঠিখানা একবার নয় দু'তিন বার পড়লেন। অন্য সময় হলে চিৎকার করে ডাকতেন, দারওয়ান, পুলিশ—পুলিশ, গ্রেপ্তার করো, গ্রেপ্তার করো কিংবা তিনি নিজেই রিভলভার নিয়ে ছুটতেন কিন্তু এ মুহূর্তে তার পা দু'খানা যেন কিসের সঙ্গে আটকে গেছে মনে হলো। দস্যু বনহুর স্বয়ং তাকে এই মুহূর্তে ড্রাইভ করে তার বাংলোয় পেঁওছে দিলো। এটা শুধু বিস্কর নয় অত্যাধিক আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ তাঁরা সমস্ত পুলিশ প্রধান আজ গভীর রাত পর্যন্ত দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধেই আলোচনা চালিয়েছে। বাংলোয় ফিরে এসেও তিনি দস্যু বনহুরকে নিয়েই ভাবছিলেন কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যু নিজে তাকে ড্রাইভ করে নিয়ে এলো...চিঠিখানা আরও একবার পড়লেন মিঃ হেলালী তারপর ডাকলেন—বয়! বয়!

বয় ছুটে এলো যদিও তার দু'চোখে ঘুমের আমেজ এখনও লেগে রয়েছে। চিঠিখানা সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ে সে হয়তো পুনরায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিলো। মালিকের ডাকে শশব্যস্তে এসে দাঁড়ালো—স্যার।

মিঃ হেলালীর হাতে চিঠিখানা এখনও রয়েছে, তিনি বয়কে লক্ষ্য করে বললেন—ড্রাইভার চিঠি দিয়ে কোথায় গেলো বলতে পারিস?

হাঁ পারি স্যার।

কোথায় গেলো সে?

স্যার তার বাসায় সে চলে গেছে।

গাড়ি কোথায়?

গেরেজে।

সে চলে গেছে?

হাঁ স্যার একটু আগে বললাম সে চলে গেছে।

আচ্ছা তুই শুরি যা।

বয় চলে যায়।

মিঃ হেলালী জানেন বয় চিঠিখানা তার হাতে পৌঁছে দেবার অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে দস্যু বনহুর এখন শত চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া অযথা সোর হাঙ্গামা বাধিয়েই বা কি লাভ হবে।

মিঃ হেলালী শয্যা গ্রহণ করলেন, তিনি এই চিঠির ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসারদের কারো কাছে টেলিফোন করলেন না বা পুলিশ অফিসেও জানালেন না।

বিছানায় শুয়ে পড়লেও তার চোখে ঘুম আসছিলো না, বারবার চিঠির কথাগুলো তার মনে আলোড়ন জাগাচ্ছিলো। দস্যু বনহুর চিঠিতে যা লিখেছে মিথ্যা নয়। পুলিশ মহল আজ দেশের অনাচারী, অত্যাচারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দুস্কৃতিকারীদের যদি কঠিন হস্তে দমন করে চলতো, যদি তাদের নিয়ে ভীষণভাবে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিতো, তাহলে দেশের আজ এমন করুন অবস্থা হতোনা। সমস্তা দেশ ব্যাপি ক্ষুধার্তের দীর্ঘশ্বাস, তাদের করুন অবস্থা দেশের মেরুদন্ডকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ সবের মূলেই যে দেশের

চোরাচালানী অসৎ ব্যবসায়ী দুষ্কৃতিকারী তাতে কোন ভুল নাই। যদিও পুলিশ মহল এ সব কিছু জানেন, বোঝেন, কিন্তু তারা কঠিন হস্তে দমনে ব্যর্থতার পরিচয় সব সময় দিয়ে এসেছেন কেনো, তারা কি পারেন না এ সব চোরা কারবারীকে খুজে বের করতে? নিশ্চয়ই পারেন কিন্তু কোথায় এবং কেনো তাদের এ দুর্বলতা.....মি হেলালী শয্যা ত্যাগ করে উঠে মেঝেতে নেমে দাড়ান, পায়চারী করে চলেন তিনি আর ভাবেন এর কি কোন বিহিত ব্যবস্থা নাই। পুলিশ মহলের কাজ হলো দেশের অন্যায়কে দূরীভূত করা। দেশের কলুষতাকে মুছে ফেলা অথচ আজ পুলিশ মহল এসব ব্যাপারে নীরব...মিঃ হেলালী সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করেন। সিগারেট পান করতে করতে পায়চারী করে চলেন। আজ দেশময় হাহাকার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই এই অশান্তির কারণ। শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কালো বাজার, মুনাফাকারীরা দিন দিন প্রবল আকারে ফেঁপে উঠছে, আর দেশের নিরীহ জনগণ ক্রমান্বয়ে মৃত্যু মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন বিহিত ব্যবস্থা নাই? মিঃ হেলালী নিজের মনকে প্রশ্ন করেন।

মিঃ হেলালী শেষের কথাগুলো স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন হঠাৎ তার পিছনে গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে—হাঁ আছে।

চমকে ফিরে তাকায় মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে দুচোখে ফুটে উঠে বিস্ময়—কে? কে আপনি?

আপনি নয় বলুন কে তুমি?

মিঃ হেলালীর দুচোখে বিস্ময়—আপনি কি দস্যু বনহুর?

হাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ হেলালী।

মিঃ হেলালী হাত বাড়ায় বনহুরের দিকে।

বনহুরও অবাক হয়ে হাত বাড়ায়।

মিঃ হেলালী করমর্দন করেন দস্যু বনহুরের সঙ্গে।

বনহুর এবং মিঃ হেলালী উভয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে উভয়ের মুখের দিকে। উভয়ে উভয়কে দেখছিলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

মিঃ হেলালীই কথা বলেন প্রথম—ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।

জানতাম চিঠির কথাগুলো আপনার মনে প্রতিক্রিয়া জাগাবে তাই যেতে পারিনি। মিঃ হেলালী আপনার মহৎ মনের পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করেছে, তাই নিভৃতে এলাম দেখা করতে। জানি আপনি আমাকে গ্রেপ্তার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন তবু আমার বিশ্বাস আছে আপনি আমাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও গ্রেপ্তার করবেন না।

মিঃ হেলালী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বনহুরের মুখে ওর কণ্ঠস্বর যেন তার কানে অদ্ভুত এক মোহ সৃষ্টি করে চলেছে। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার নিয়ে পুলিশ মহলে এতো তোড় জোর আর সেই দস্যু বনহুর তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলছে।

বনহুর বলে চলেছে—ভাবছেন আমার দুঃসাহস কম নয়। আপনি জানেন আমি যা করেছি বা করছি তা মোটেই অন্যায় নয়। আমি শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। আইনের চোখে হয়তো অপরাধ হতে পারে কিন্তু এ ছাড়া দুষ্কৃতিকারীগণকে শায়েস্তা করার ঔষধ আমার কাছে আর নেই, তাই আমি হয়তো অনিচ্ছা সত্বেও এ কাজ করে থাকি। মিঃ হেলালী দেশের অন্যায় অনাচার দূর করতে হলে দেশের প্রতিটি মানুষকে হতে হবে অন্যায় বিরোধী। বিশেষ করে পুলিশ মহলকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে, যেন দুষ্কৃতিকারীগণ তাদের কাছে কোন রকম সহায়তা না পায়। একটু থেমে বলে বনহুর—সহায়তা মানে দুষ্কৃতিকারীগণকে সাহায্য করা নয়। যেমন ধরুন মিঃ ফিরোজ রিজভী কান্দাই শহরের সবচেয়ে অসৎ ব্যবসায়ী ছিলেন অথচ তিনি পুলিশ মহলের কাছে সব চেয়ে মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। শুধু পুলিশ মহলই নয়, দেশের গন্যমান্য স্বনামধন্য ব্যক্তি প্রত্যেকেই তাকে সমীহ করতো শ্রদ্ধাও করতো কারণ তিনি জানতেন এই সব মানুষকে কেমন করে হাতের মুঠায় রাখতে হয়। মিঃ হেলালী, পুলিশ মহলের কর্তব্য দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মহৎ ব্যবহারে বা তাদের প্রতাপে বিন্দু বিসর্গ বিচলিত না হয়ে ন্যায়তভাবে কাজ করে যাওয়া।

মিঃ হেলালী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আপনি যে কথাগুলো বললেন প্রতিটি শব্দ মূল্যবান স্বীকার করি কিন্তু দোষীকে হত্যা করা আইনত অপরাধ।

এ কথা আমি পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি মিঃ হেলালী। কিন্তু এ পথ ছাড়া আমার তো কোন পথ নেই কারণ আপনি এটাও জানেন দুস্কৃতিকারী যদি অপরাধী হিসাবে ধরাও পড়ে তবু তাদের সাজা দেওয়া কোন দিনই সম্ভব হয়না কারণ দুস্কৃতিকারী হয়তো দেশের স্বনামধন্য কোন ব্যক্তি। পুলিশ মহল তাদের কাছে ঋণীও থাকে সর্বক্ষণ। কারণ আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবেনা। মিঃ হেলালী আপনি এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত আমি জানি কাজেই আপনার উপর দেশবাসীর যথেষ্ট ভরসা আছে। আজ বেশিক্ষণ বিলম্ব করা সম্ভব হবে না। চলি এবার কেমন?

মিঃ হেলালী বললেন—চলুন আমি গেট অবধি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

বনহুর হেসে বললো—চলুন।

পাশাপাশি দু'জন বেরিয়ে এলো বাংলা থেকে। গেট অবধি এগিয়ে এসে উভয়ে বিদায় নিলো উভয়ের কাজে।

ফিরে এলেন মিঃ হেলালী নিজের শয়ন কক্ষে। অনাবিল এক আনন্দে ভরে উঠেছে তাঁর মন। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। একটি সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই দ্বীপ্ত শান্ত কথাগুলো। যাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনি কয়েক মিনিট পূর্বেও মনে মনে কৌশল আটছিলেন আর এই মুহূর্তে সে তার কাছে একজন মহান পুরুষ হিসাবে গণিত হলো।

অনাবিল একটা শান্তি অনুভব করলে মিঃ হেলালী নিজে মনে। অল্পক্ষণেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন পুনরায় দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার নিয়ে কমিটির মিটিং বসলো। সেখানে দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানা রকম আলাপ আলোচনা চললো। আলোচনা চললো বনহুরের হত্যা রহস্য নিয়ে।

মিঃ হেলালী আজও যোগ দিয়েছেন কিন্তু আজ তিনি ধীরস্থির গম্ভীর। গত রাতের ঘটনাগুলো তার মনকে এখনও অভিভূত করে রেখেছে। তিনি ভাবছেন গত রাতটা তাঁর জীবনে এক পরম রাত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

❑

মিস হুসনা এই নিন আপনার আব্বার সরকারী পোশাক সেদিন যা আপনার বিনা অনুমতিতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বিস্ময় ভরা চোখ দু'টো তুলে ধরলো হুসনা, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মিঃ চৌধুরী আপনি।

হাঁ, মিঃ চৌধুরী নয় দস্যু বনহুর।

বসুন।

আপনি ভয় পাচ্ছেন না তো?

সত্যি, আপনি ভয়ের বস্তু বটে। মিঃ চৌধুরী, বলুন তো এই যে পরপর কান্দাই শহরে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে এ সব আপনার কাজ?

অবিশ্বাসের কিছু নেই মিস হুসনা।

সত্যি বলছেন?

আপনি জানেন মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

দু'চোখ কপালে তুলে ঢোক গিলে বলে হুসনা—লোকে যাই বলুক আমি বিশ্বাস করিনা এ কথা। আমি জানি আপনি খুন করতে পারেননা।

একটু হেসে বলে বনহুর—যারা আমাকে ভালবাসে তারা কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে চায়না। আপনি তাদের একজন।

মিঃ চৌধুরী, আপনি নরহত্যা করতে পারেন?

কর্তব্যের খাতিরে অভ্যস্থ।

বুঝলাম যারা অন্যায় করে যারা দুর্নীতিবাজ তাদের আপনি শায়েস্তা করেন কিন্তু মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তাঁর সঙ্গীগণ কি অপরাধ করেছিলো আপনার কাছে?

অপরাধ! না শুধু আমার কাছে নয় সমস্ত কান্দাই বাসীর কাছে তাঁরা অপরাধী ছিলেন। বিনা অপরাধে দস্যু বনহুর কারো কেশাগ্র স্পর্শ করেনা মিস হুসনা। হাঁ, জেনে রাখুন অচিরেই মিঃ রিজভীর ২নং পার্টনার দুনিয়ার পাটগুটিয়ে নেবেন।

মিঃ রিজভীর ২ নং পার্টনার! কে, কে সে?

যাক্ ও সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানো কোন প্রয়োজন নাই। এবার শুনুন, কেনো আপনার আব্বার সরকারী ড্রেস আমি নিয়েছিলাম?

কেনো, কি দরকার ছিলো এগুলো আপনার?

দরকার আপনার আব্বার ছদ্মবেশে মিঃ রিজভী এবং তার দলকে ফলো করা। কাজ শেষ হয়েছে তাই এগুলো ফেরৎ দিলাম। মিস হুসনা এখন অচিরেই আপনার আব্বাকে আপনারা ফেরৎ পাবেন।

আব্বা! আমার আব্বা বেঁচে আছে মিঃ চৌধুরী?

হাঁ, বেঁচে আছেন এবং সুস্থ শরীরেই আছেন তিনি।

কোথায় আছেন বলুন মিঃ চৌধুরী? আমার আব্বা কোথায় আছেন।

যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আচ্ছা আজ চলি মিস হুসনা।

মিঃ চৌধুরী আপনি কি আলেয়ার আলো? সত্যি সবাইকে আপনি শুধু বিমুগ্ধ করেন কিন্তু কাউকে ধরা দেননা।

যা বলবেন আমি তাই, আলেয়ার আলোই বলেন আর ধূমকেতুই বলেন বা কুহেলিকা-ই বলেন। মিস হুসনা, সত্যি সেই দিনগুলির কথা আজও মনে পড়ে, সেই কুন্দল দ্বীপে আমরা দু'জনা বেশ ছিলাম। ফিরে এসে আবার জড়িয়ে পড়েছি এক কঠিন সমস্যার সঙ্গে।

মিঃ চৌধুরী, আমিই কি ভুলতে পেরেছি সেদিনের কথাগুলো। ঐ দিনগুলোর স্মৃতি আমাকে আজও আনমনা করে ফেলে। সত্যি আপনি আর আমি কত সুখে ছিলাম...

ঠিক ঐ মুহূর্তে মায়ের কণ্ঠস্বর—হুসনা! হুসনা।

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—চলি মিস হুসনা।

আবার আসবেন তো?

আসবো। বনহুর কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে যায় যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

হুসনা দরজা খুলে দেয়—মা তুমি ডাকছো?

হাঁ, হাঁরে হুসনা তোর ঘরে কেউ যেন কথা বলছিলো না?

কই না তো?

তবে যে হাল্‌লু বললে।

হাল্‌লু এ বাড়ির পুরোন চাকর। সে ঘরের বাহির বেরিয়ে ছিলো কলতলায় যাবার জন্য। হঠাৎ তার কানে ভেসে এসেছিলো হুসনা আপার ঘরে কোন পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মাকে ডেকে এনেছিলো সে।

হুসনা ঢোক গিলে বললো—হয়তো স্বপ্নে আমিই কথা বলছিলাম। কি বলতে যে কি বলেছি ভেবে পাচ্ছি না। তুমি যাও আম্মা ঘুমাবে যাও।

কি স্বপ্ন দেখছিলি মা?

একটা শুভ স্বপ্ন আজ দেখেছি আম্মা, কাল সকালে তোমাকে বলবো।

হাঁ, রাতে স্বপ্নের কথা বলতে নাই কাল সকালে বলো। হুসনার আম্মা চলে যান।

হুসনা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। প্রাণ ভরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে হুসনা—সে এসেছিলো আবার আসবে বলে গেছে।

❑

পদশব্দে মুখ তুললেন মিঃ আহসান সাহেব। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল রুক্ষ—দৃষ্টি ঘোলাটে। চোখ তুলে তাকিয়েই বলে উঠেন —আর কতদিন আমাকে তুমি বন্দী করে রাখবে বনহুর?

হাস্যোজ্বল দীপ্ত কণ্ঠে বলে বনহুর—আর বেশি দিন নয়। আপনি অচিরেই আপনার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

সত্যি! সত্যি তুমি আমায় মুক্তি দেবে?

শুধু আপনার স্ত্রী কন্যার মুখের দিকে তাকিয়েই আমি আপনাকে মুক্তি দেবো মিঃ আহসান। কিন্তু মনে রাখবেন অন্যায়কে কোন মুহূর্তে প্রশ্রয় দেবেন না। সে যেই হোকনা কেন।

যা বলবে আমি তাই করবো বনহুর, আমি তাই করবো.....

বেশ আপনি প্রস্তুত থাকবেন অচিরেই আপনাকে আমরা আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো।

সত্যি তো?

কেনো বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে?

বিশ্বাস করি এবং চিরদিন করবো। মিঃ আহসান গভীর আবেগে কথাগুলো বললেন।

বনহুরের শরীরে জমকালো ড্রেস।

অদ্ভুত লাগছে তাকে।

মিঃ আহসান অবাক চোখে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। মিঃ আহসানের মনে পড়ে সেদিনের কথা তিনি কিছু সংখ্যক পুলিশ ফোর্স নিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ির ওখানে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার উদ্দেশ্য নিয়ে। শুধু তিনিই নন আরও পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন সেদিন কিন্তু কারো ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটলো না, ঘটলো তারই ভাগ্যে। তিনি কোন কারণ বশতঃ পুলিশ বাহিনীদের ছেড়ে একটু দূরে সরে এসেছিলেন অমনি দু'জন লোক তাকে ধরে ফেলে এবং মুখে রুমাল চাপা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন মিঃ আহসান। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলেন একটি অর্দ্ধ অন্ধকার কক্ষ মধ্যে শয্যায় শুয়ে আছেন। এখন তিনি কোথায়, কে বা কারা তাকে এখানে এনেছেন কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি তখন। পারলেন অনেক পরে, একটা লোক খাবার দিয়ে গেলো। মিঃ আহসানের অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিলো তাই তিনি খাবার সম্মুখে পেয়ে চুপ থাকতে পারলেন না।

খেলেন পেট পুরে তারপর নির্জন কক্ষে একা একা। কখনও পায়চারী করতে লাগলেন কখনও শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন অনেক কথা। প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এখন বন্দী কিন্তু কে তাকে এ ভাবে বন্দী করে রাখলো কি উদ্দেশ্য তার? যে লোকটা খাবার দিয়ে গেলো সে পুনরায় যখন এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আহসান, আমি এখন কোথায়? এবং কে আমাকে এখানে এনেছে? কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে? মিঃ আহসানের কথায় লোকটা একটি মাত্র জবাব দিয়েছিলো সেদিন, বিলম্ব করুন সব জানতে পারবেন। জেনেছিলেন দু'দিন পরে। মিঃ আহসান বসে বসে সিগারেট পান করছিলেন। এখানে তিনি সেবনের জন্য তার প্রিয় সিগারেট থেকে বঞ্চিত হন নি। শুধু সিগারেটই নয়, সব কিছুই তিনি পেয়েছেন যা তার নিত্য প্রয়োজনীয়। এমনকি সংবাদপত্রও তাঁকে পড়তে দেওয়া হয়েছে রীতিমত। মিঃ আহসান সংবাদপত্রে তাঁর নিখোঁজ নিয়ে পুলিশ মহলের উদ্বিগ্নতা জানতে পেরেছেন। পুলিশ মহল জানেনা তিনি কোথায় আছেন। তিনি স্বইচ্ছায় আত্মগোপন করেছেন না কেউ তাকে বন্দী করেছেন কিংবা তিনি নিহত হয়েছেন এ সব নিয়ে সংবাদপত্রে নানা রকম সংবাদ তিনি পড়েছেন। এমনকি তাকে দাড়ি কামানোর জন্য সব সরঞ্জামও দেওয়া হয়েছে। মিঃ আহসান বসে বসে ভাবছিলেন ঠিক্ ঐ সময় কেউ যেন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো। চোখ তুলে অবাক হলো, দেখলো তার কন্যার উদ্ধারকারী মিঃ চৌধুরী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মিঃ আহসান ভীত হলেন কারণ মিঃ চৌধুরীর আসল পরিচয় তার অজানা ছিলোনা। তিনি বুঝতে পারলেন তাকে দস্যু বনহুর বন্দী করেছে।

ততক্ষণে বনহুর এসে দাঁড়ালো মিঃ আহসানের পাশে, একটু হেসে বললো—গুড মর্নিং মিঃ আহসান।

মিঃ আহসান শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলেছিলেন—দস্যু তুমি আমাকে বন্দী করে এনেছো?

জবাব দিয়েছিলো বনহুর—হ্যাঁ।

কিন্তু কেনো? প্রশ্ন করছিলেন মিঃ আহসান।

বনহুর বলেছিলো সেদিন—আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দেবনা মিঃ আহসান! মনে রাখবেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই আমি আপনাকে আটক করে রেখেছি এবং যতদিন কাজ আমার সমাধা না হবে ততদিন আপনাকে আমি আটক রাখতেই বাধ্য হবো।

হেসে বললো বনহুর—এখানে আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো? ঠিক করে বলবেন মিঃ আহসান।

না, কোন অসুবিধা হয়নি আমার। সত্যি দস্যু হলেও তুমি মহৎ... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মিঃ আহসানের গলা।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো, কারো মুখে নিজের প্রশংসা শোনার মত সময় তার নেই।

❑

পুলিশ অফিসার মিঃ ইয়াসিন নিহত হবার পর থেকে শহরে ভীষণ এক চাঞ্চল্যতা পরিলক্ষিত হলো। এতো সাবধানতার মধ্যেও মিঃ ইয়াসিনকে দস্যু বনহুর হত্যা করলো কম কথা নয়।

কান্দাই জনগণের মনে দারুণ উৎকুণ্ঠা যদিও তারা জানে বিনা কারণে দস্যু বনহুর কাউকে হত্যা করেনা তবু মনে সবার আতঙ্ক না জানি কোথায় কে আবার প্রান হারাবে।

দিনের পর দিন এ আতঙ্ক বেড়েই চলেছে।

মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীগণ নিহত হবার পর মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভীষণভাবে ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কারণ মিঃ ফিরোজ রিজভী নিজকে রক্ষা করার জন্যই কান্দাই ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন তার তিনজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং সহকারী। পরে আর একজন সহকারী কেমন করে ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো কান্দাই বাসী না জানলেও মিঃ গিয়াস উদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন দস্যু বনহুরের অসাধ্য

কিছু নেই। তাকেও যেন মিঃ রিজভীর সঙ্গে একত্রিত করে বাক্সে প্যাকেট করা হয় নাই তাই আশ্চর্য।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের সদা মৃত্যু ভয়, সে জানে এতো সাবধানতা এটা দস্যু বনহুরের কাছে কিছু নয়। সে যে কোন মুহূর্তে কখনও যমদূতের মত তার সম্মুখে হাজির হবে কে জানে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভাবছিলেন আর ক'দিন তার আয়ু আছে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি বাইরে বের হননা। সদা সর্বদা প্রহরাবেষ্টিত হয়ে থাকেন। এমন কি রাতে যখন ঘুমান তখন তার বিছানার চার পাশে চারজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় থাকে। বাড়ির বাহির তো দূরের কথা, ঘরের বাইরে মিঃ গিয়াস উদ্দিন বের হননা কোন সময়! নাওয়া-খাওয়া সব চলে তার শয়ন কক্ষে। বাইরের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। একমাত্র স্ত্রী এং চারজন বিশ্বস্ত প্রহরী ছাড়া নিজের ছোট ভাই এরও প্রবেশ নিষেধ রয়েছে মিঃ গিয়াসের কক্ষে।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের সাবধানতার কথা শহরের কারো অজানা ছিলোনা।

নানা জনে নানা রকম মতবাদ প্রকাশ করছে এ ব্যাপার নিয়ে। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের এতো ভয়, সাবধানতা কেনো। তিনি যদি সৎ এবং মহৎ ব্যক্তিই হবেন তবে তিনি বাড়ির বাইরে আর বের হলনা কেনো? কেনোই বা এতো প্রহরীর ব্যবস্থা? অনেকেই বলছে ফিরোজ রিজভীর মৃত্যুই তার ভয়ের কারণ।

সমস্ত রাত ঘুম হতোনা গিয়াস উদ্দিন সাহেবের। শুধু মৃত্যু চিন্তাই নয় ব্যবসা সংক্রান্ত নানা রকম চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক করতো। লোভি ব্যক্তিদের মৃত্যু ভয়ের চেয়েও অর্থ চিন্তা বেশি। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের অবস্থা তাই হয়েছে। লাখ লাখ টাকার কারবার তার বন্ধ প্রায় কারণ তিনি আর এসব ঠিক মত দেখা শোনা করতে পারছেন না। প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা যার আয় তিনি কি পারেন প্রাণের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকতে। উসখুস করে তার মন, মাঝে মাঝে হিসাব নিকাশ দেখেন ঘরে বসেই।

সেদিন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ব্যবসা ব্যাপার নিয়ে বিদেশ থেকে এলেন তার এক পুরোন পার্টির লোক। কার্ড পাঠিয়ে জানালেন তিনি জব্রু থেকে এসেছেন।

কার্ড নিয়ে কে যাবেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কাছে। শুধু তার স্ত্রী এবং চারজন প্রহরী ছাড়া কারো সাধ্য নেই তার কক্ষে প্রবেশ করে।

শেষ পর্যন্ত একজন প্রহরীই কার্ড নিয়ে এলো। মিঃ গিয়াস উদ্দিন কার্ড দেখে দীপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি তক্ষুণি তাকে ডেকে পাঠালেন কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হলো এ কক্ষে কারো প্রবেশ নিষেধ আছে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে চুপ রইলেন, পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা না করলেও নয়। কারণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন যদি দেখা না করেন তবে ঐ টাকা নিয়ে ফিরে যাবেন তিনি। মিঃ গিয়াস উদ্দিন একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন—জান যায় যাক্ তবু টাকা তার চাই।

অনেক ভেবে চিন্তে পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা করাই মনস্থির করে নিলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন সাহেব। কিন্তু কোথায় কি ভাবে তিনি দেখা করবেন। যদি দস্যু বনহুর জানতে পারে এ কথা। তিন লক্ষ টাকা আর গিয়াস উদ্দিন এর জীবন এ দুটোর জন্যই সে হামলা করে বসতে পারে।

গিয়াস উদ্দিন সাহেব ফোন করলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীর কাছে। পার্টির লোকের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। অথচ দস্যু বনহুরকেও ভয় আছে এমন অবস্থায় কি করবেন তিনি।

মিঃ জায়েদী জানালেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। দস্যু বনহুর কিছু না করতে পারে এবং তিনিও যেন সুষ্ঠভাবে পার্টির লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন তার সুব্যবস্থা করবেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন ভরসা পেলেন, যা হোক একটা উপায় হবে।

ফোনে আরনও আলাপ হলো কখন কোথায় কি ভাবে পার্টির লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এটা। ব্যবস্থা অত্যন্ত গোপনীয় শুনে খুশি হলেন গিয়াস উদ্দিন সাহেব।

জব্রু থেকে পার্টির লোক এসেছেন তিনি গিয়াস কোম্পানীর হেড অফিসেই অপেক্ষা করছেন। তার সুবিধা অসুবিধার দিকে গিয়াস কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন যেন কোন ত্রুটি না হয়।

মিঃ জায়েদীকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে মিঃ গিয়াস উদ্দিন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। বেশি জানাজানি যাতে না হয় এ জন্য আর কাউকে জানালো না। এমন কি জাফরীকেও জানানো তেমন প্রয়োজন মনে করলেন না গিয়াস উদ্দিন সাহেব।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন সন্ধ্যার পর তার শয়ন কক্ষে প্রহরী পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় মিঃ জায়েদীর উপস্থিতিতে জব্রু থেকে আগত পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে মনোস্থির করে ফেললেন।

গোপনে সেই মত আয়োজন চললো।

সন্ধ্যার পর গিয়াস কোম্পানী থেকে একখানা গাঢ় লাল গাড়ি এসে দাঁড়ালো মিঃ গিয়াস উদ্দিনের বাস ভবনের সম্মুখে।

ইতিমধ্যে মিঃ জায়েদী এসে পৌঁছে গেছেন গিয়াস উদ্দিনের হল ঘরে।

কয়েকজন পুলিশ সশস্ত্রভাবে পাহারা দিচ্ছে।

লাল গাড়ি থেকে নামলেন জব্রু থেকে আগত অতিথি। মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ছোট ভাই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে হল ঘরে নিয়ে গেলেন।

মিঃ জায়েদীর সঙ্গে পরিচিত হলেন জব্রু থেকে আগত মিঃ জুইস্ হার্ড। সুন্দর সুদীর্ঘ সুপুরুষ মিঃ জুইস হার্ড এলেন, হাতে তার ব্রিফকেস্।

মিঃ জায়েদী তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিনের ছোট ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ জায়েদীর সঙ্গে মিঃ জুইস্ হার্ডের।

মিঃ জায়েদী নিজে মিঃ জুইসকে নিয়ে উঠে গেলেন উপরে মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কক্ষে।

সিড়ির ধাপে ধাপে অস্ত্রধারী প্রহরী।

মিঃ জায়েদীর সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স।

সাধ্য কি দস্যু বনহুর প্রবেশ করে সেখানে।

কক্ষ মধ্যে মিঃ গিয়াস উদ্দিন মিঃ জুইস হার্ড এবং মিঃ জায়েদীকে অভিনন্দন জানালেন।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন এবং মিঃ জুইস হার্ড কিছুক্ষণ তাদের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা চললো। বেশিক্ষণ এ কক্ষে বিলম্ব করা ঠিক নয় বলে জানালেন মিঃ জায়েদী।

এবার টাকা গ্রহণের পালা।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন আপনি আপনার পাশের গোপন কক্ষে গিয়ে টাকাটা গ্রহণ করুন কেনোনা এখানে আমরা ছাড়াও আরও চারজন প্রহরী আছে, কথাটা বাইরে ফাঁস হওয়া অসম্ভব কিছু না। কাজেই আপনি এ ব্যাপারে সতর্ক হন।

মিঃ জায়েদীর কথা অবহেলা করতে পারলেন না গিয়াস উদ্দিন। তিনি মিঃ জুইসকে সঙ্গে করে পাশের কামরায় গেলেন।

পাশের কামরার কোন দরজা জানালা ছিলোনা। সম্পূর্ণ কক্ষমিলে একটি দরজা, সে দরজাও মিঃ গিয়াস উদ্দিনের শয়ন কক্ষের মধ্য দিয়ে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ ছিলো না।

মিঃ গিয়াস উদ্দিন এবং মিঃ জুইসহার্ড তাদের কাজ শেষ করছেন।

এ দিকে মিঃ জায়েদী একটি সংবাদ পত্র দেখছিলেন।

কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেন মিঃ জুইস হার্ড।

মিঃ জায়েদী বললেন—আপনাদের কাজ সমাধা হয়েছে?

হাঁ হয়েছে। কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন জুইসহার্ড এবং সিগারেট কেস বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—নিন আমরা ততক্ষণে ধুমপান করি আর মিঃ গিয়াস উদ্দিন টাকাগুলো হেফাযতে রেখে আসুন।

মিঃ জায়েদী মিঃ জুইস হার্ডের সিগারেট কেস থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিঃ জায়েদী রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো...পরক্ষণেই তিনি বললেন মিঃ জুইসহার্ড গিয়াস কোম্পানী থেকে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে, এক্ষুণি আপনাকে যেতে হবে বিশেষ কোন জরুরি কাজ আছে।

মিঃ জুইস এক মুখ হেসে বললেন—ধন্যবাদ, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি মিঃ জায়েদী।

মিঃ জায়েদী বললেন—মিঃ গিয়াস উদ্দিন এখনও বেরিয়ে আসছেন না কেনো?

মিঃ জুইস হার্ড বললেন—হয়তো তাঁর কাজ শেষ হয়নি। আপনি বলবেন আমি চলে গেছি কারণ তার কাছে বিদায় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে। ধন্যবাদ মিঃ জায়েদী...ব্রিফকেস হাতে উঠে দাঁড়ান এবং মিঃ জায়েদীর সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে যান তিনি।

মিঃ জায়েদী সিগারেট পান করতে করতে অপেক্ষা করতে থাকেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের এই বুঝি এলেন তিনি।

সিড়িতে জুইস হার্ড এর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়।

মিঃ জায়েদী ক্রমান্বয়ে অস্থির হয়ে পড়েন এতোক্ষণও মিঃ গিয়াস উদ্দিনের কাজ সমাধা হলো না। ভাবলেন হয়তো বা টাকাগুলো পুনরায় গণনা করে দেখছেন। অনেক টাকা কাজেই দেরী একটু হবেই। মিঃ জায়েদী পুনরায় নিজের পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন তারপর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্রত্যাগ করে চললেন।

কিন্তু এতোক্ষণও বেরিয়ে এলেন না মিঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ।

মিঃ জায়েদী হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এতোক্ষণও মিঃ গিয়াস উদ্দিন তার টাকা গণনা শেষ করতে পারলেন না আশ্চর্য বটে। উঠে দাড়ালেন তিনি, তারপর পাহারাদার চারজনকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা কেউ ভিতরে যাও গিয়ে দেখো মিঃ গিয়াস উদ্দিন কি করছেন? এতোক্ষণও তিনি বেরিয়ে আসছেন না কেনো?

পাহারারত চারজনের দু'জন ভিতরে চলে গেলো এবং পর মুহূর্তে চিৎকার করে বেরিয়ে এলো। মিঃ জায়েদী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন—ব্যাপার কি?

পাহারাদার দু'জনের মুখ মন্ডল ফ্যাকাশে মরার মুখের মত রক্ত শূন্য। কোন কথা তারা বলতে পারছেনা।

মিঃ জায়েদী আর দু'জনকে আবার অন্য নির্দেশ দিলেন, কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা তারা কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো। তাদের চোখে মুখে ভয় বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছে, কেউ কোন কথা বলতে পারছে না।

একজন বললো—স্যার আপনি গিয়ে দেখুন।

মিঃ জায়েদী এবার বললেন—চলো আমি যাচ্ছি। মিঃ জায়েদী দরজা বিহীন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই তিনি দেখতে পেলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন সোফায় বসে আছেন তার বুকে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে। চোখ দুটো উপরের দিকে উল্‌টে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মুখের মধ্যে রুমাল গোঁজা, যেন কোন রকম শব্দ তার গলা দিয়ে বের না হয় একজন তার বুকে ছোরা বিদ্ধ করবার পূর্বে তার গলার মধ্যে রুমাল গুজে দেওয়া হয়েছে। গাল দু'টো বলের মত ফুলে আছে। ঠোঁট দু'টো ফাঁকা হয়ে আছে বিকৃত আকারে।

মিঃ জায়েদী দু'হাতে চোখ ঢাকলেন।

এমন সময় কেউ যেন মিঃ জায়েদীর কাঁধে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে তাকাতেই অবাক হলেন, দেখলেন মিঃ হেলালী তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিঃ জায়েদী বললেন—আশ্চর্য মিঃ হেলালী—আশ্চর্য এ হত্যাকান্ড।

শুনেছি স্যার তাই গাড়ি নিয়ে ছুটে এলাম। বললেন মিঃ হেলালী।

মিঃ জায়েদীর দু-চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে—এই মাত্র হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো অথচ আপনি শুনেছেন?

হাঁ, কারণ, যে মিঃ গিয়াস উদ্দিনকে হত্যা করেছে সেই আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছে এ হত্যাকান্ডের কথা।

আশ্চর্য।

আশ্চর্য কিছুই নয় স্যার মিঃ জুইস্ হার্ড ই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হতাশা ভরা কণ্ঠে বললেন মিঃ জায়েদী—এখন তাই দেখছি মিঃ হেলালী সেই ব্যক্তিই দস্যু বনহুর। একটু থেমে বললেন—আমাকেও হাবা বানিয়ে ছাড়লো সে।

এটা আপনার কোন দোষ নেই স্যার আপনার সাবধানতার কোন ত্রুটি হয়নি। যদিও সে আপনার সাবধানতার সুযোগই গ্রহণ করেছিলো সর্বত ভাবে।

মিঃ জায়েদীর মুখমন্ডল রাগে ক্ষোভে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

মিঃ হেলালী দেখলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিনের বুকে ছোরা খানার পাশে একটি কার্ড লাগানো রয়েছে। কার্ডে কিছু লেখা আছে বলে মনে হলো। মিঃ হেলালী কার্ড খানা খুলে নিলেন নিহত গিয়াসের বুক থেকে। পড়লেন তিনি—

২নং জল্লাদ—
তার মহৎ আচরণ এবং মহৎ
ব্যবসার জন্য তাঁকে পুরস্কার
দিলাম।

—দস্যু বনহুর

মিঃ জায়েদী বললেন—ফিরোজ রিজভী ও তার সহকারীদের বুকেও এই চিহ্ন ছিলো।

হাঁ স্যার, কারণ মিঃ গিয়াস উদ্দিন ও মিঃ ফিরোজ রিজভীর সহকারী ছিলো এবং তিনি যে ২নং তাতে কোন ভুল নাই।

মিঃ জায়েদী তাকিয়ে আছেন নিহত মিঃ গিয়াস উদ্দিনের মুখের দিকে। একটু পূর্বে যে ব্যক্তি বাঁচার জন্য এতো সাবধানতা অবলম্বন করলেন আর কিনা এই বীভৎস পরিণতি।

ছোরাখানার বাট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো ফোটা ফোটা।

মিঃ জায়েদী বললেন—কি অমানুষিক হত্যা। জানিনা কবে এ হত্যালীলা শেষ হবে।

মিঃ হেলালী বললেন—এ অমানুষিক হত্যা লীলার জন্য দায়ী আমরাই স্যার। কারণ দেশময় আজ নানা অনাচার অবিচার দুর্নীতি চোরা কারবার দেশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অথচ আমরা পুলিশ মহল এর কোন রকম বিহিত ব্যবস্থা করতে পারছিনা। দেশের জনগণ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, প্রতিটি জিনিসের মূল্য শুধু পঞ্চম গুণ নয় দশম গুণ বেড়েছে। এক টাকার জিনিস আজ দশ টাকা। স্যার বলুন এমন

অবস্থায় দেশের ক'জন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। দেশের এক শ্রেণীর মানুষ আজ অনাচার আর দুর্নীতি করে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এক টাকার জিনিস তারা দশ টাকায় কেনো বিশ টাকায় কিনতেও পিছপা হয় না। আজ অথচ আজ দেশের যারা মেরুদন্ড সেই অসহায় মানুষের কি নিদারুণ অবস্থা। থামলেন মিঃ হেলালী তারপর বললেন—পুলিশ মহল যখন দুর্নীতি অনাচার অবিচার দমনে সক্ষম হচ্ছেন না তখন কেউ না কেউ দেশ ও দশের মর্মান্তিক অবস্থা লক্ষ্য করে কঠিন কঠোর হস্তে এই হত্যা লীলায় মেতে উঠেছে...

মিঃ জাফরী বললেন—একটু পূর্বে বললেন যে এই হত্যালীলা সংঘটিত করেছে সে নিজে, আপনাকে টেলিফোনে জানিয়েছে এ হত্যালীলার কথা?

হাঁ, এবং সে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

কোথা থেকে ফোন করেছিলো বলতে পারেন?

যদি সে কথা বলতে পারতাম তাহলে এখানে না এসে গুটি কয়েক পুলিশ সহ সেখানেই ছুটে যেতাম। স্যার এবার লাশ পরীক্ষার জন্য মিঃ গিয়াস উদ্দিনের প্রাইভেট ডাক্তারকে ফোন করা হোক। এখনও তো বাইরের কেউ জানে না বা জানতে পারেনি এ হত্যালীলার কথা।

মিঃ হেলালী এতোবড় একটা হত্যাকান্ড আমাদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়ে গেলো অথচ আমরা হত্যাকারী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না এটা কত বড় লজ্জার কথা।

স্যার, লজ্জার কোন কারণ নেই। সবাই জানে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা সহজ ব্যাপার নয়।

মিঃ হেলালী আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ করছেন।

স্যার, না করেই বা উপায় কি আছে বলুন? একবার নয় দু'বার নয়, বার বার আমরা পুলিশ বাহিনী তার কাছে পরাজয় বরণ করছি। স্যার, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের চেয়ে এখন আমাদের বেশি হুসিয়ার হতে হবে দেশের অন্যায় অনাচার দুর্নীতি দমন করা। দেশের এই বিষাক্ত জীবাণু দুস্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করে তাদের শায়েস্তা করা—যারা দেশের এই মর্মান্তিক অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে।

সেদিন আর বেশি কথা হয় না, ততক্ষণে লোকজন জেনে নিয়েছে মিঃ গিয়াস উদ্দিন নিহত হয়েছেন, কাজেই ভীড় জমে যায় বাড়ির সম্মুখে।

❑

ডাক্তার আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। সত্যি আপনি মহান মহৎ....কথাগুলো বলে বনহুর ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে মায়ের ঘরে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তলে তাকালেন মরিয়ম বেগম সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—ওরে তুই এসেছিস?

হাঁ মা, তোমাকে দেখতে এলাম। বনহুর এসে মায়ের কোলের কাছে নিচে বসে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে—মা, মাগো তুমি সেরে উঠেছো!

মরিয়ম বেগম পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— হাঁ বাবা, সেরে উঠেছি।

মা, ডাক্তারের মুখে আমি তোমার সব সংবাদ শুনতাম। কখন তুমি কেমন আছো সব তিনি আমাকে বলতেন।

ওরে তুই কেনো আসিস নাই বলতো?

মা তোমাকে নতুন করে কি বুঝিয়ে বলবো বলো? তুমি তো জানো ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিলো না কারণ সব সময় পুলিশ ফোর্স এ বাড়ির উপর কড়া নজর রেখেছে। তাছাড়া একদিন আমি এসেছিলাম তুমি সেদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে। সত্যি মা-গো—সেদিন তোমাকে এক নজর দেখে আমার মনে কি যে কষ্ট হয়েছিলো তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবোনা।

ওরে আমি জানি, সব জানি, তবু মন মানে না। তোকে দেখবার জন্য প্রাণ আমার অস্থির হয়ে উঠে!

তাইতো আমি ছুটে আসি। দেখো মা, তুমি আমার জন্য আর ভাবতে পারবে না। আবার যদি তোমার অসুখ হয় তাহলে আমি আর আসবো না বলে দিচ্ছি।

আজ কেমন করে এলে বাপ?

মা, সে এক অদ্ভুত কান্ড। ডাক্তারের সহায়তায় তাঁরই কম্পাউন্ডারের বেশে এসেছি। সত্যি তিনি বড় মহৎ ব্যক্তি।

হাঁ বাবা, আমি যখন অসুস্থ তখন ডাক্তার সব সময় তোর সম্বন্ধে আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন। সত্যি তার কথাগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করতো।

সব শুনেছি মা, আমি ডাক্তারের মুখে সব শুনেছি। ডাক্তার আমাকে কথা দিয়েছিলেন তোমাকে তিনি আরোগ্য করে তুলবেন। তাঁর কথা সত্য হয়েছে তুমি আরোগ্য লাভ করেছো...

এমন সময় নূর প্রবেশ করে সেই কক্ষে, বলে উঠে—আব্বু তুমি কখন এলে? আম্মি আম্মি দেখবে এসো কে এসেছে.....

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে নূরকে টেনে নেয় কাছে, বলে সে কেমন আছো আব্বা?

নূর হেসে বলে—বলবোনা তুমি বড্ড দুষ্টো হয়েছো কত দিন আসোনি।

রাগ করোনা আব্বা। আমি অনেক দূরে গিয়েছিলাম তাইতো আসতে পারিনি।

অনেক দূরে? সে কোন দেশ আব্বু বলোনা?

আচ্ছা তোমাকে বলবো সে এক নতুন দেশ।

চলো আগে আম্মির কাছে চলো। নূর পিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে।

মনিরা গোসল শেষ করে সবে মাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে।

নূর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বলে উঠে—দেখো আম্মি কে এসেছে.....

মনিরা চোখ তুলে তাকাতেই মুহূর্তে তার মুখ-মন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়ে।

নূর হেসে বলে—আম্মি আব্বু এসেছে তুমি কথা বলছোনা কেন? জানো আম্মি আব্বু কেনো এতোদিন আসেনি? অনেক দূর দেশে গিয়েছিলো, অনেক অনেক দূর দেশ। আব্বু সেই দেশের গল্প বলে শোনাবে। তুমি শুনবেনা আম্মি?

না।

কেনো। কোনা শুনবেনা আম্মি?

পরে বলবো, তুমি এখন যাও তো বাবা।

নূর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যায়। কতদিন পর তার আব্বু এসেছে অথচ তার আম্মি তার সঙ্গে কথা বলছেনা এটা খুব খারাপ লাগে নূরের।

নূর বেরিয়ে যেতেই বনহুর এসে দাঁড়ালো মনিরার সম্মুখে, দু'হাতে টেনে নেয় কাছে ওকে নিবিড়ভাবে।

মনিরা বলে উঠে—না, আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা। তুমি শুধু অমানুষ হওনি, তুমি নর পশু হয়েছো....

মনিরা যা খুশি তাই বলো। যত খুশি বলো।

ভেবেছিলাম এখন মানুষ হয়েছো কিন্তু ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি কি হয়ে গেছো? চারিদিকে শুধু খুন আর খুন। এতো রক্ত পিপাসা তোমার?

ধীরে ধীরে গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠে বনহুরের মুখ মন্ডল, দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠে সে—রক্ত পিপাসা নয় মনিরা রক্তের নেশা। আমি রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি। কিন্তু কাদের রক্ত জানো? যারা নিরীহ মানুষের রক্ত শুষে নেয় তাদের.....

পরবর্তী বই

রক্তের নেশা

রক্তের নেশা-৭২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

তুমি এমনি করে দিনের পর দিন নর হত্যা করে যাবে? বলো এতে তুমি কি আনন্দ পাও? মনিরা দু'হাতে স্বামীর জামার আস্তিন চেপে ধরে ঝাকুনি দেয়—বলো তুমি কি আনন্দ পাও?

মনিরা তুমি বুঝবেনা। শুধু এ টুকু জেনে রাখো তোমার স্বামী অহেতুক নর হত্যা করে না।

মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তার কয়েকজন সহকারী কি অপরাধ করেছিলো তোমার কাছে? কি অপরাধ করেছিলেন ইন্সপেক্টর ইয়াসিন? কি অপরাধ করেছিলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন? বলো এরা কি অপরাধ করেছিলো যার জন্য তুমি এদের এভাবে হত্যা করেছো? চুপ করে রইলে কেনো জবাব দাও আমার কথার?

মনিরা সব কথা সব সময় বলা যায় না।

তোমাকে আমি পুলিশের হাতে স্বঁপে দেবো।

তাই দাও, তাই দাও আমাকে, পুলিশের হাত তুলে দাও। কিন্তু জেনে রাখো মনিরা পুলিশের সাধ্য নাই এই রক্তের নেশা বন্ধ করে। মনিরা শোন, ফিরোজ রিজভীকে আমি কেনো হত্যা করেছি। সে দেশের মানুষের চোখে একজন মহৎ মহান ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে।

তবু তুমি তাকে হত্যা করেছো?

হাঁ করেছি, জানো কেনো করেছি? মিঃ ফিরোজ রিজভীর মত অসাধু ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে না। তার ব্যবসা ছিলো দেশের জনগণের মুখের আহার হরণ করে গোপনে বিদেশে চালান দেওয়া। এতে সে লক্ষ লক্ষ টাকাই পেতোনা, পেতো কোটি কোটি টাকা। আর সেই টাকা সে ইচ্ছামত জলস্রোতের মত খরচ করতো তার ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। দেশের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিদের সে সব সময় খুশি রাখতো যাতে দেশবাসী জানেন সে মহৎ আর মহান ব্যক্তি। মনিরা আরও শোন, শুধু ফিরোজ রিজভী নয় তার সহকারীগণ সবাই তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলোনা। তারা দিনের পর

দিন দেশকে শোষণ করে নিঃসার করে ফেলছিলো। তিল তিল করে চুষে নিচ্ছিলো এরা অসহায় মানুষের বুকের রক্ত।

এতো সব করতো, কিন্তু পুলিশ বা দেশের জনগণ কিছু জানতো না।

জানতো সবাই কিন্তু কারো বলবার ক্ষমতা ছিলোনা কারণ তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য ধনবান মানুষ। দেশবাসী প্রায় সবাই কিছু না কিছু ঋণী তার কাছে। পুলিশ মহল সদা উপকৃত মাঝে মাঝে খানা পিনা চলতো তার বাস ভবনে। তাছাড়া কখনও কখনও বড় সাহেবের বাসায় বা পুলিশ প্রধানের বাংলোয় উপঢৌকন আসত কাজেই তাদের মুখ বন্ধ। এ সব দেখেও না দেখার অভিনয় করতে বাধ্য ছিলেন তাঁরা।

সত্যি বলছো?

মিথ্যা বলবো স্ত্রীর কাছে? কেনো মিথ্যা বলবো মনিরা। তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, আমার কথাগুলো মিথ্যা না সত্য। দেশ আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে দেশের মানুষ উন্মাদ হতে আর বেশি বিলম্ব নাই। বনহুর থামলো, তারপর মনিরার হাত ধরে খাটের পাশে এসে বসলো, মুখ-মন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে—বলতে শুরু করলো সে—দেশে ফসল পূর্বের চেয়ে কোন অংশে কম হচ্ছেনা। কৃষক সমাজ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসশ্য উৎপাদন করে চলেছে কিন্তু দিনের পর দিন খাস্যসশ্যের মূল্য কমার চেয়ে দশগুণ বেড়ে গেছে বা যাচ্ছে। কৃষকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করলেও তারা সে ফসলে উদর পূর্ণ করতে সক্ষম হচ্ছেনা। কারণ মুনাফাকারী, কালোবাজারী দল রক্ত চোষা বাদুড় বা ভ্যাম্পায়ারের মত ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র। চাষীরা উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে এরা নানা ছলনায় কলা কৌশলে এ সব খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে নেয়, তারপর করে গুদামজাত। পরে লোক চক্ষুর অন্তরালে ট্রাক বোঝাই করে চালান দেয় দেশের বাইরে। হঠাৎ যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এসব মাল আটক হয় তখন টেলিফোন কিংবা চিঠি আসে পুলিশের হেড অফিসে। পুলিশ অফিসার জানতে পারেন এ মাল সাধারণ কোন ব্যক্তির নয়, দেশের স্বনামধন্য কোন মহান জনের, কাজেই বিনা কসুরে খালাস।

মনিরা নির্বাক হয়ে শুনতে থাকে স্বামীর কথাগুলো।

বনহুর বলেই চলেছে—শুধু আজ নয়, চিরদিন এই অনাচার অত্যাচার অবিচার চলে এসেছে ক্রমান্বয়ে দেশবাসীর উপর। নিস্পেষিত হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণী মানুষের কাছে। জন্মের পর থেকেই দেখছি শুধু হাহাকার আর হাহাকার। ক্ষুধার্তের করুন ক্রন্দন আমাকে বিচলিত করেছে। মনিরা তুমি বুঝবে না, তোমার মত অবস্থায় যারা আছে তারা বুঝবেনা সেই সব মানুষের ব্যথা। এই দেশের বুকেই কত নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যাচ্ছে। কত মা সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে না পেরে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে তার কত আদরের ধনকে। কত মা ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে নয়নের মণিকে অন্ধকুপে নিক্ষেপ করে নিজেও ঝাপিয়ে পড়ছে কুপের গভীর অতলে। বলো বলো মনিরা হিসাব রাখো এই সব অসহায় জননীদের। কত পিতা, স্ত্রী কন্যা আহার যোগাতে না পেরে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে পৃথিবীর এ অভিযোগ থেকে মুক্তি নিয়েছে। আরও কত শুনতে চাও তুমি? এই দেশের আনাচে কানাচে শত শত অনাহারী মানুষ আজ তিল তিল করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। মনিরা এদের এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কারা? কোন শ্রেণীর মানুষ তারা? চুপ করে আছো কেনো, জাবাব দাও, তারা কারা?

স্বামীর কঠিন মুখমন্ডল আর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে—মনিরাকে স্তম্ভীত করে তোলে, ভাবে মনিরা, সত্যি তো দেশের ক'জন মানুষের সন্ধান তারা নিতে পারে? কত নিরীহ মানুষ আজ অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে কে তার হিসাব রাখে। কিন্তু এ সবের জন্য দায়ী কারা?

জানি, বলতে পারবে না, জবাব দিতে পারবে না আমার প্রশ্নের। কারণ যে ব্যথিত নয় সে কোন দিন ব্যথার কি জ্বালা তা বুঝবে না। তোমরা উপর তলার মানুষ নিচের তলার মানুষের অবস্থা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হবার কথা নয়।

তুমি আমাকে ভুল বুঝছো?

ভুল নয় সত্যি। ক্ষুধার কি জ্বালা কি কষ্ট কোন দিন তা অনুভব করছো? সে অবস্থা কোন দিনই আসবে না উপর তলার মানুষের কারণ তারা নিচের তলার মানুষের বুকের রক্ত শোষণ করেই তো উপর তলার মানুষ হয়েছে।

তুমি এসব কি বলছো?

সত্যি কথা বলছি মনিরা, না বলে আজ তুমি তোমার স্বামীকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইতে না। আজ যে সত্য কথা বলে— ন্যায় নীতি যে মেনে চলে তাদের স্থান নেই সভ্য সমাজে। কারণ আজকাল সত্য কথা বলা, ন্যায় নীতি মেনে চলা অপরাধ। মিথ্যা জাল-জুয়াচুরী যারা করে, যারা একজন আর একজনের হাত চুষে খায় তারাই সমাজের মেরুদন্ড।

কিন্তু আর বেশি দিন এ অবিচার চলবে না। বললো মনিরা।

—বনহুরের কণ্ঠ নরম হয়ে এলো, এবার সে বললো—মনিরা এ ধারণা তোমার ভুল, কারণ যুগ যুগ ধরে এ অবিচার আসছে। এক দল মানুষ আর একদল মানুষকে নিস্পেষিত করে সমাজে স্বনামধন্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। তারা কোন দিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয়নি আর এক দলকে।

এমনিই কি চিরদিন চলবে? একদল চির দিন আর এক দলের পায়ের নিচে পিষে মরবে?

প্রতিবাদ এসেছে! সেই নিস্পেষিত দলটির মনে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে তাদের আত্মচেতনা। কেনো তারা কি মানুষ নয়? তাদের দেহে কি রক্ত মাংস নেই? কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে এই আত্মচেতনা জেগেছে তখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, উন্মাদ হয়ে উঠেছে, কারণ তারা আর নিস্পেষিত হতে রাজি নয়। কিন্তু তারা প্রতিদানে কি পেয়েছে জানো? ষ্টিম রোলারের কষাঘাত। হয় চাবুক নয় গুলি। কোন দিনই উপর তলার মানুষ নিচের তলার মানুষকে মাথা তুলতে দেয়নি।

ওগো কোনদিনই কি এর সমাধান হবে না?

হয়তো হবে, সেদিন কবে আসবে জানি না। যেদিন একদল আর একদলকে শোষণ করার সুযোগ পাবে না পারবেনা একদল আর এক দলকে পিষে মারতে। মনিরা নরহত্যা আমি করতে চাই না। যারা নর হত্যা করে তাদের আমি ঘৃণা করি, শাস্তি দান করি কিন্তু যখন আমি দেখি ঐ ব্যক্তি সব কিছু সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন আমি বেছে নেই তাকে পৃথিবী থেকে সরানোর মুক্ত পথ। যাতে সে ব্যক্তি আর কাউকে শোষণ করতে না পারে বা কাউকে নিস্পেষিত করতে না সক্ষম হয়। হত্যা আমার পেশা নয় নেশাও

নয়। আইন আদালত যাকে শায়েস্তা করতে পারে না, আমি শুধু তাকে শায়েস্তা করি। দেশের জনগণের মুখের আহার যারা কেড়ে নিয়ে ধনকুবেরু বনে যায়, তাদের আমি ক্ষমা করি না। মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার দলবল সবাই ছিলো এক নং চোরা কারবারী, মিঃ গিয়াস উদ্দিন তার প্রধান সহকারী। মিঃ ইয়াছিনের কথা বললে, তিনি চোরা কারবারী ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বাস ঘাতক। দস্যু বনহুর কোন দিন বিশ্বাস ঘাতককে ক্ষমা করে না।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর তারপর বলে উঠে—মনিরা বাইরে ডাক্তার হুসাইন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তুমি এমনি করে আর কতদিন পালিয়ে পালিয়ে আসবে আর যাবে বলো তো?

হয়তো এমনি করেই আমার জীবন কেটে যাবে। মনিরা..... গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

কতদিন স্বামীকে নিবিড়ভাবে কাছে পায়নি। স্বামীর প্রশস্ত বুকে নিজেকে বিলিয়ে দেয় মনিরা।

❑

গভীর রাত।

মিঃ হেলালী আপন মনে কাজ করছিলেন। সম্মুখ টেবিলে রাশিকৃত কাগজপত্র ছড়ানো।

পাশের ত্রিপয়ায় টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

খট্ করে একটা শব্দ হলো।

চমকে চোখ তুললেন মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আপনি।

একমুখ হেসে বললো বনহুর—কেউ কোনদিন আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেন না অথচ আপনি আমাকে বড় লজ্জা দেন মিঃ হেলালী।

কারণ সবাই আপনাকে ভুল বোঝে, তাই.....হাত বাড়ায় মিঃ হেলালী দস্যু বনহুরের দিকে।

দস্যু বনহুরও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মিঃ হেলালীর সঙ্গে।

মিঃ হেলালী বললেন—বসুন।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ হেলালী টেবিল থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন—নিন।

বনহুর সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজতেই মিঃ হেলালী সিগারেট লাইট জ্বালিয়ে ধরলেন।

বনহুর অগ্নিসংযোগ করলেন তার সিগারেটে তারপর একমুখ ধুঁয়া ছেড়ে বললেন—মিঃ হেলালী, কাগজপত্র ঘেঁটে দেশের দুস্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। ডি আই বি পুলিশ ছড়িয়ে দিন এবং কৌশলে সন্ধান নিয়ে দেখুন আপনাদের আশে পাশেই পরম পরিচিতজনদের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে দুস্কৃতিকারী দল।

একথা মিথ্যা নয়, কিন্তু আজকাল লোক চেনাই মুস্কিল। মুখে বড় বড় বুলি আওড়িয়ে মহৎ মহৎ বাণী শুনিয়ে অনেক শয়তান সাধু সেজে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছে।

শুধু সর্বনাশ নয় মিঃ হেলালী, দেশকে এক চরম অবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। অহঃরহঃ এরা দেশের জনগণের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমি চাই আপনি পুলিশ মহলকে এ ব্যাপারে সচেতন হবার জন্য অনুরোধ জানাবেন। দুস্কৃতিকারী যত স্বনাম ধন্য ব্যক্তিই হন না কেনো, আইনের চোখে তারা অপরাধী, কাজেই ক্ষমা করা কাউকে চলবে না। আমি জানি পুলিশ মহলের মধ্যেও অনেক দুস্কৃতিকারী রয়েছেন যাদের সহায়তায় কাজ হাসিল করছে শোষক দল।

আপনি ঠিক বলেছেন।

মিঃ হেলালী দেশের দুস্কৃতিকারী দমনে প্রথমে পুলিশ মহলের প্রত্যেকটি লোককে দুস্কর্ম মুক্ত করতে হবে। এ জন্য পুলিশ প্রধানদিগকে অত্যন্ত সতর্কবান হতে হবে, যদি কেউ কোন অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে, যেন ক্রমান্বয়ে তারা সৎ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। হাঁ, আর

একটি কথা দেশ থেকে যতক্ষণ ঘুষ প্রথা দূর না হয় ততক্ষণ দেশের উন্নতি সাধন হবে না!

কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালো বনহুর, চোখে মুখে তার খুশি ভরা দীপ্ত ভাব।

হাত বাড়ালো সে মিঃ হেলালীর দিকে।

মিঃ হেলালীও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন—আপনার কথাগুলো স্মরণ থাকবে।

একজন পুলিশ প্রধান আর একজন দস্যু প্রধান মিলে যখন করমর্দন করছিলো তখন অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতরণ হয়েছিলো।

বনহুর যে পথে এসেছিলো সেই পথে চলে গেলো।

মিঃ হেলালী আসন গ্রহণ করলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেবিলে ফোন বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং শব্দে।

মিঃ হেলালী রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরতেই ভেসে এলো মিঃ জায়েদীর কণ্ঠস্বর.....হ্যালো মিঃ হিলালী আপনি শীঘ্র চলে আসুন, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে.....আমি পুলিশ অফিস থেকে ফোন করছি.....

মিঃ হেলালী বলে উঠলেন...স্যার দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে...বলেন কি স্যার...

...হাঁ, আপনি চলে আসুন...এখানে আমি এবং মিঃ হারুন মিঃ শওকত এবং আরও কয়েকজন...অপেক্ষা করছি...

মিঃ হেলালীর মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো কারণ তিনি জানেন যাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অফিসে আনা হয়েছে সে দস্যু বনহুর নয় কারণ দস্যু বনহুর এই মাত্র তার সম্মুখে উপস্থিত ছিলো, সে কয়েক মিনিট হলো মাত্র বিদায় নিয়ে গেছে।

তবু না গেলে নয়, মিঃ হেলালী খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লেন। ও'ভার কোটটা গায়ে দিয়ে নেমে এলেন নিচে।

একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ হেলালী—গাড়ি বের করতে বলো।

পুলিশ গিয়ে ড্রাইভারকে জানালো।

ড্রাইভার গাড়ি বের করলো।

মিঃ হেলালী গাড়িতে চেপে বসে বললো—পুলিশ হেড্ অফিসে চলো।

গাড়ি ছুটলো।

অফিসে পৌছে দেখলেন মিঃ হেলালী রাত দুপুরেও ভীড় জমে গেছে অফিস প্রাঙ্গনে। প্রায় জন সমুদ্র বলা চলে, গাড়ি অফিসের সম্মুখে থামতেই দু'জন পুলিশ সেলুট করে সরে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী কিছু অবাক না হয়ে পারলেন না, তিনি মনে মনে হাসলেন তারপর অফিস কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ জায়েদী মিঃ হাসেম মিঃ কাওসার এবং মিঃ শওকতকে দেখতে পেলেন। তারা সবাই ব্যস্তভাবে কি সব আলোচনা করছেন। এমন কি মিঃ জাফরীও আছেন সেখানে।

মিঃ হেলালী জানেন আর কেউ দস্যু বনহুরকে না চিনলেও মিঃ জাফরী তাকে চিনবেই কিন্তু তিনি যখন উপস্থিত আছেন তখন নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিই যে দস্যু বনহুর তাকে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি করে তা সম্ভব হয় কারণ মিঃ হেলালীর কাছ থেকে মিনিট কয়েক পূর্বে দস্যু বনহুর বিদায় নিয়ে যাবার পর পরই ফোনে মিঃ জায়েদী তাকে জানালেন, আপনি শীঘ্র চলে আসুন দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিলোনা তার, তবু এলেন, না এসে কোন উপায় ছিলোনা। মিঃ জায়েদীর আহ্বান উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এসে দেখছেন ব্যাপারটা সত্যই হবে।

মিঃ হেলালীকে দেখে পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদী বললেন—এসেছেন মিঃ হেলালী।

হাঁ স্যার, না এসে পারি? আশ্চর্য দস্যু বনহুর তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দী হলো? মিঃ হেলালী কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—দস্যু বনহুরকে কি করে এবং কোথায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো স্যার জানতে পারিনি এখনও?

মিঃ জায়েদীই বললেন—সে সব কথা পরে শুনবেন চলুন আগে দস্যু সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা যাক।

মিঃ হেলালীর ভ্রু কুঞ্চিত হলো, সত্যিই কি তাহলে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে। কেমন যেন একটা দ্বন্দ্বতায় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

মিঃ জায়েদীর সংগে মিঃ হেলালী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পূর্বে তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এখনও হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

কয়েকটা পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছে পুলিশ অফিস প্রাঙ্গনের এক পাশে। সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স মেশিনগান উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ অফিসের চার পাশে।

মিঃ জাফরী একমনে সিগারেট পান করে চলেছেন। তাঁকে বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার সহ মিঃ হেলালী এসে পৌঁছলেন পুলিশ অফিসের লৌহ কারাগারের সম্মুখে।

মিঃ হেলালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছেনা দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে।

লৌহ ফটকের ১নং দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করবেন পুলিশ প্রধানগণ।

২নং লৌহগেট তারপর ৩নং ৪নং পাঁচ নম্বর লৌহফটকের ওপারে বন্দী করে রাখা হয়েছে দস্যু বনহুরকে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী সর্বাগ্রে তাদের পিছনে রয়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

লৌহকারা কক্ষে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন মিঃ হেলালী। অদূরে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। চোখ দুটো তার মুদিত, হাতে এবং পায়ে মোটা জমবুত লৌহ শিকলে আবদ্ধ।

মিঃ হেলালী স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে একি করে সম্ভব হলো। দস্যু বনহুর কি করে এরেষ্ট হলো। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান মাত্র তার নিকট হতে বিদায় নিয়ে ছিলো সে, কিন্তু....

মিঃ জায়েদী বললেন...বড় ক্লান্ত তাই ঘুমাচ্ছে।

মিঃ হেলালী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আশ্চর্য বটে।

মিঃ জায়েদী বললেন—একে আজই হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া দরকার বলে মিঃ জাফরী জানিয়েছেন।

মিঃ হেলালী কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চললেন।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণও ফিরে চললেন।

অফিস কক্ষে ফিরে আসতেই বললেন মিঃ জাফরী—আর মোটেই বিলম্ব করা উচিৎ নয় আজ রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

মিঃ জায়েদী বললেন—রাতে পাঠানো কি ঠিক্ হবে মিঃ জাফরী? দস্যু বনহুরের অনুচরগণ কোন রকম হামলা করে বসতে পারে।

সে কথা সত্য কিন্তু দিনে জনগণের যে ভীড় হবে তা রাতের জন সমুদ্রের চেয়ে শতগুণ বেশি, কাজেই—আমার মতে রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানোই ভাল হবে। মিঃ জাফরী কথাগুলো বলে আর একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো ব্যাপার নিয়ে পুলিশ মহল নানারকম আলাপ আলোচনা চললো। সংগে সংগে টেলিফোনে সংবাদ সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়লো।

বিশেষ করে পুলিশ বাহিনী এবং কান্দাই মিলিটারী ফোর্স শসব্যস্ত হয়ে উঠলো।

কান্দাই প্রেসিডেন্ট ভবনেও সংবাদ পৌঁছে গেলো। দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে, তাকে রাতে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস বন্দী শালায় বন্দী করে রাখা হবে না হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে? প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট আবু গাওসের জানালেন—রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো উচিৎ, না হলে সে পুলিশ অফিস বন্দীশালা থেকে পালাতে পারে।

প্রেসিডেন্টের কথা অমান্য করা যায় না কাজেই দস্যু বনহুরকে রাতেই হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো সাব্যস্থ হলো।

পুলিশ মহল এবং মিলিটারী বাহিনী মিলে প্রস্তুতি চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শহরের রাজপথ মিলিটারী ট্রাক আর পুলিশ ভ্যানে গম গম করে উঠলো। পুলিশের সাংকেতিক হুইসেল আর বাঁশীর শব্দে ভরে উঠলো চারিদিক।

প্রতিটি বাড়ির আলো নীভে গেলো। বাড়ির লোকজনের মনে জাগলো আতঙ্ক। না জানি দস্যু বনহুরকে পুলিশ মহল আটক করে রাখতে সক্ষম হবেন কিনা কে জানে।

স্ত্রী স্বামীর বুকে মুখ লুকালো, ওগো দস্যু বনহুর যদি পালাতে সক্ষম হয় তাহলে কার বাড়িতে ঢুকে পড়বে কে জানে। যদি কোন মেয়েকে সম্মুখে পায় তার অবস্থা কি হবে।

স্বামী স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরলো, কেউ বা পিস্তল কেউ বা ছোরা যে যা পারলো অস্ত্র প্রস্তুত করে নিয়ে বসে রইলো। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত কারো স্বস্তি নেই।

মায়ের বুকে কুকড়ে আছে সন্তান, দস্যু বনহুর যদি পুলিশ বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে পালায়। যদি এসে হাজির হয় তাদের বাড়ির তিন তলার ছাদে তখন কি হবে। সবার মনেই ভয় আর উদ্বিগ্নতা।

পুলিশ প্রধান থেকে সাধারণ পুলিশ পর্যন্ত নিদ্রাহীন ভাবে ছুটোছুটি করে চললো। কেমন করে কিভাবে দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে এই হলো সবার চিন্তা। পথের দু'ধারে মিলিটারী ফোর্স এবং সশস্ত্র পুলিশ প্রহরারত রইলো।

কোন মুহূর্তে, কখন, দস্যু বনহুরকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে সেই আদেশের প্রতিক্ষায় রইলো পুলিশ বাহিনী।

ভোর রাতে দস্যু বনহুরকে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

পরদিন সংবাদপত্রে বিরাট আকারে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সংবাদ প্রকাশ পেলো।

মিঃ জাফরী নিজে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসার মিঃ নাসের উদ্দিন হাফ্সীকে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিয়ে গেলেন এবং একটি অনুষ্ঠানে সমস্ত পুলিশ মহলের সম্মুখে প্রেসিডেন্ট নিজ হস্তে ঐ চেক দান করলেন হাফ্সীর হস্তে।

ফটোগ্রাফার রিপোর্টার অবিরত মিঃ হাফ্‌সীসহ প্রেসিডেন্ট আবু গাওসারের ফটো গ্রহণ করেন চললো। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা ধরনের ফটো ছাপা হলো।

দেশে আবার একটা স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করলো। তবে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় সবাই খুশি হলো না, অনেকেই নীরবে চোখ মুছলো।

চৌধুরী বাড়িতে নামলো আবার একটা দুঃচিন্তার ছায়া। তবে প্রকাশ্য এ ব্যাপারে নিয়ে কেউ আলাপ করতে পারতো না কারণ এখন নূর বুঝতে শিখেছে কাজেই সব ব্যথা গোপনে হজম করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলো না।

মরিয়ম বেগমকেও জানালো হলোনা কথাটা কারণ তিনি সবেমাত্র কঠিন অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। একেই তো তিনি পুত্র চিন্তায় অস্থির তারপর আবার যদি তিনি এ কথা শোনেন তাহলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না কিছুতেই।

শুধু সরকার সাহেব আর মনিরা মিলে গোপনে চলতো আলা আলোচনা।

নীরবে চোখ মুছতো মনিরা।

নূর যখন ছোট ছিলো তখন হয়তো সে নিজেই স্বামীর বন্দী ব্যাপার নিয়ে ছুটে গেছে হাঙ্গেরী কারাগার অবধি। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, নূর জানতে পারলে হয়তো বিভ্রাট ঘটতে পারে।

বুকের ব্যথা বুকে চেপে রইলো মনিরার।

এদিকে পুলিশ মহল নিশ্চিন্ত হলো, আর শহরের সর্বত্র কড়া পাহারা প্রয়োজন হবে না। আর চৌধুরী বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকতে হবে না সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে।

কিন্তু মিঃ হেলালী কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বার বার তাঁর কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দস্যু বনহুরের সেই রাতের কথাগুলো—"দেশের দুস্কৃতি দমনে প্রথমে পুলিশ মহলের প্রতিটি লোককে দুস্কর্মমুক্ত করতে হবে। এজন্য পুলিশ প্রধানদের অত্যন্ত সতর্কবান হতে হবে। যদি কেউ কোন অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে যেন ক্রমান্বয়ে তারা সৎ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। হাঁ, আর একটি কথা, দেশ

থেকে যতক্ষণ ঘুষ প্রথা দূর না হয় ততক্ষণ দেশের উন্নতি সাধন হবে না।"
মিঃ হেলালী মনে মনে শপথ গ্রহণ করলেন, বনহুরের কথাগুলো মেনে চলবেন এবং সেই মত পুলিশ মহলকে সতর্ক করে দেবেন যেন পুলিশ মহলে কোন দুস্কৃতিকারী গজিয়ে উঠতে না পারে। কিন্তু দস্যু বনহুর কি করে গ্রেপ্তার হলো তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে দেখলেন কান্দাই হেড পুলিশ অফিসের লৌহ কারা কক্ষে বন্দী দস্যু বনহুরকে তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। মনটা দমেও গিয়েছিলো, ঐ মুহূর্তে কারণ তিনি যা বিশ্বাস করতে পারেননি তাই যেন ঘটে গেছে।

মিঃ হেলালী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন গত রাতের কথাগুলো, দস্যু বনহুরকে যখন কান্দাই হেড পুলিশ অফিসের লৌহ কারা কক্ষ থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিলিটারী ভ্যানে উঠানো হচ্ছিলো তখন দস্যু বনহুরের দৃষ্টি একবার এসেছিলো তার দিকে, আশ্চর্য তাকে দেখে কোন রকম ভাবের সঞ্চার হলো না তার চোখে মুখে। মিঃ হেলালী অবশ্য এতে অবাক হন নি কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুর বুদ্ধিমান সে কিছুতেই নিজের মনোভাবকে প্রকাশ পেতে দেবে না। সে জন্যই হয়তো দস্যু বনহুর তার দিকে ফিরে তাকালো না। যদি কোন রকম ভাব ফুটে উঠে তার মুখ মন্ডলে। যদি অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ কিছু মনে করে বসেন।

.....মিঃ হেলালীর চিন্তার বিরাম নাই।

❑

হুসনা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। রাত বেশি না হলেও দশটার কম নয়। তবু চোখে ঘুম লাগছে না। একটা দুঃচিন্তার ছায়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটি মুখ বারবার ভেসে উঠছে তার চোখের সম্মুখে। মিঃ চৌধুরীই দস্যু বনহুর, তিনি আজ বন্দী, শুধু বন্দীই নয় হাঙ্গেরী কারাগারে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। হয়তো তার মৃত্যুদন্ড হবে আর কোন দিন

দেখা হবেনা তার সঙ্গে...কথাটা ভাবতেই হুসনার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

এমন সময় মিসেস আহসান কন্যার কক্ষে প্রবেশ করে বলেন —হুসনা মা ঘুমিয়েছিস?

হুসনা মায়ের পদ শব্দ পেয়ে দু'চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে পড়েছিলো, মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারলোনা, বললো ...আম্মা আমায় ডাকছো?

মিসেস আহসান কন্যার শয্যার পাশে এসে বসে বললো—এখনও ঘুমাও নি হুসনা?

না মা, চোখে ঘুম আসছে না।

আমিও ঘুমাতে পারছি না। জানিস হুসনা কাল তোর আব্বার জন্ম দিন। ঐ দিনে তোর আব্বা প্রতি বার আমাকে মূল্যবান কোন একটা জিনিস উপহার দিতেন। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন মিসেস আহসান।

হুসনা বললো—আমি জানি আব্বা ঐ দিন তোমাকে কিছু না কিছু দিতেন । তিনি ঐ দিন তোমার মুখে হাসি দেখতে ভাল বাসতেন। আম্মি আমি তোমাকে বলেছিলাম না একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি, তোমায় বলবো। আজ তোমাকে বলি কেমন শুনবে?

শুনবো, বল মা বল?

আমি স্বপ্নে দেখেছি আব্বা বেঁচে আছেন, আবার ফিরে আসবেন।

সত্যিই, তোর স্বপ্ন যেন সত্যি হয় মা।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। পরক্ষণেই দারোয়ানের কণ্ঠস্বর—আম্মা সাহেব এসেছেন! সাহেব এসেছেন...

এক সঙ্গে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ালো হুসনা আর মিসেস আহসান। বেরিয়ে এলো তারা বাইরে।

ততক্ষনে অন্তপুরে প্রবেশ করেছেন মিঃ আহসান।

প্রথমে যেন মিসেস আহসান বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না নিজেদের চোখকে। সত্যিই কি মিঃ আহসান ফিরে এসেছেন তাহলে।

আহসান সাহেব আনন্দে কেঁদে ফেলেন। কন্যাকে বুকে আকঁড়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—ভাল ছিলে মা হুসনা?

হুসনাও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—হাঁ, ভালছিলাম আব্বা। চলো ঘরে চলো।

আহসান সাহেব কন্যা স্ত্রী সহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

হুসনা পিতার মুখে তাকিয়ে দেখলো পূর্বের চেয়ে পিতার স্বাস্থ্য আরও ভাল এবং বলিষ্ঠ হয়েছে। আরও ফর্সা হয়েছেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস আহসান—ওগো এতো দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেনো আসোনি? বাড়ির কথা কি মনে ছিলো না তোমার?

অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন মিঃ আহসান সাহেব তিনি বললেন—কোথায় ছিলাম আমি নিজেও জানিনা। কেনো আসিনি বুঝতেই পারছো আসার কোন উপায় ছিলোনা। আর বাড়ির কথা মনে ছিলো কিনা তা তোমাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে পারবোনা। অহঃরহ বাড়ির কথা মনে পড়েছে কিন্তু করবার কিছু ছিলোনা। তবে তোমাদের সংবাদ সব সময় পেয়েছি।

আব্বা সত্যি বলছো? জিজ্ঞাসা করে বসলো হুসনা।

মিঃ আহসান বললেন—হাঁ মা সত্যি তোমরা কেমন আছো এবং তোমরা আমার জন্য কি ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে সব খবর আমি পেয়েছি।

হুসনা বললো—জানি কে তোমায় এ সংবাদ দিতো।

জানিস! জানিস মা?

হাঁ আব্বা। মিঃ চৌধুরীর মুখে আমি সব শুনেছি!

সত্যি মা, দস্যু হলেও সে একজন মহৎ ব্যক্তি তাতে কোন ভুল নেই। আমি ঘৃণা করতাম কিন্তু আজ তাকে সমিহ করি।

আব্বা!

হাঁ মা, কিন্তু বড় আফসোস আজ সে বন্দী...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মিঃ আহসানের গলা।

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে রাত ভোর হয়ে আসে।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে প্রখ্যাত পুলিশ গোয়েন্দা মিঃ আহসান ফিরে এসেছেন। পুলিশ মহলের সবাই দেখা করতে আসেন তার সঙ্গে।

সবাই অনুমানে বুঝে নিলেন দস্যু বনহুর তাকে বন্দী করে রেখেছিলো এবার বনহুর নিজে বন্দী হওয়ায় মিঃ আহসান সাহেব পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

মিঃ আহসান স্ত্রী কন্যার কাছে যা বললেন ততখানি খোলাসা আর কারো কাছে বললেন না। শুধু তিনি জানালেন দস্যু বনহুর তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিলো এবং আটক করে রেখেছিলো কোন এক গোপন কারাকক্ষে। তাকে যে ভাবে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো পুনরায় সেই ভাবে রেখে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে থেকে আসার সময় তিনি দস্যু বনহুরকে দেখেন নি বলে জানালেন। তিনি আরোও জানালেন কে বা কারা তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছে তিনি ঠিক বলতে পারেন না। কারণ তার চোখ সব সময় কালো কাপড়ে বাঁধা ছিলো।

মিঃ আহসানের কাছে বেশি কিছু জানতে পারলেন না পুলিশ কর্মকর্তাগণ, কাজেই তারা কোন সঠিক হদিস খুঁজে পেলেন না। মিঃ আহসান ইচ্ছা করেই কতটা গোপন করে গেলেন!

হুসনা কিন্তু পিতাকে ধরে বসলো, সব কথা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে।

মিঃ আহসান না বলে পারলেন না।

সেদিন দোতালার ছাদে বসে সিগারেট পান করছিলেন মিঃ আহসান ঐ সময় হুসনা এসে পিতার পাশে দাঁড়ায়ে—আব্বা আজকে তোমার শরীর কেমন আছে?

ভালই আছি মা।

হুসনা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। দু'চোখে তার উৎসুক ভাব ফুটে উঠেছে।

মিঃ আহসান সিগারেট থেকে কয়েক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বলতে শুরু করলেন—আমি সেদিন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ির অদূরে আমার সঙ্গীদের নিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিলাম। অন্যান্য পুলিশ অফিসার পুলিশ বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অন্যান্য দিকে।

রাত বেড়ে আসছে।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

আকাশে তারাগুলো জোনাকীর মত পিট পিট করে জ্বলছে।

ফিরোজ রিজভীর অদূরে কোন গির্জা থেকে ঘন্টা ধ্বনি হলো, আমি তখন সামান্য বিশ্রামের আশায় গির্জাভিমুখে রওয়ানা দিলাম কারণ খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ আমার দু'পাশ থেকে দু'জন লোক আমাকে ধরে ফেললো; সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে ওরা রুমাল চেপে ধরেছে বলে মনে হলো আমার। তারপর ওরা আমাকে একটা গাড়িতে তুলে নিলো বলে মনে হলো, এরপর আর আমার কিছু মনে নেই।

তারপর যখন জ্ঞান হলো দেখি সুন্দর একটি বিছানায় শুয়ে আমি কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি, স্মরণ হচ্ছে পূর্বের ঘটনাগুলো। কেমন যেন সব এলো মেলো লাগছে। মাথাটা তখনও ঝিম ঝিম করছিলো।

ভাবছি আমি কোথায়, ঠিক ঐ সময় একজন লোক এসে বললো—উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিন।

আমি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটা কোন শ্রমিক হবে। শরীরে শ্রমিকের পোশাক। আমি ওর কথায় উঠে বসলাম, তারপর বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়ে কোনদিকে যাবো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটা আমাকে পথের নির্দেশ দিলো। আমি সেই পথে কিছুটা এগুতেই দেখলাম একটি অদ্ভুত স্নানাগার। আমি সেই স্নানাগারে ইচ্ছামত স্নান করে নিলাম। তারপর দেখতে পেলাম এক পাশে নানা ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ থরে থরে সাজানো, আমি ইচ্ছামত আমার পরিধান উপযোগী জামা কাপড় পরে নিলাম।

বেরিয়ে আসতেই দেখলাম লোকটা স্নানাগারের বাইরে আমার জন্য প্রতিক্ষা করছে। আমাকে বললো, আসুন আমার সঙ্গে। আমি অনুসরণ করলাম। পুনরায় একটি কক্ষে আমাকে নিয়ে লোকটা প্রবেশ করলো। আমি দেখলাম কক্ষ মধ্যে একটি গোলাকার টেবিলে বহু রকম খাবার সাজানো রয়েছে। ক্ষুধায় পেটটা আমার চোঁ চোঁ করছিলো। আমি প্রতিক্ষা করছিলাম লোকটা আমাকে খাবার জন্য বলে কিনা।

হুসনা বলে উঠলো—আব্বা তুমি তো মোটেই খিদে সহ্য করতে পারোনা।

হাঁ মা, তাই-তো সব ভুলে খিদেটা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। লোকটা আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ করলো। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম।

খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত কোনদিকে তাকিয়ে দেখলাম না। পেটপুরে খেলাম তারপর ফিরে গেলাম বিশ্রাম কক্ষে দুগ্ধ ফেনিল শুভ্র বিছানা, সত্যি মা তোকে কি বলবো, খুব আরামে ঘুমালাম।

একদম জামাই আদরে ছিলে তাহলে?

ঠিক বলেছিস মা,. জামাই আদর কাকে বলে।

বুঝেছি সে জন্যই আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিলে?

তা-নয় মা তা-নয় তোদের কথা কোন সময় ভুলিনি, বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য নাওয়া খাওয়া করেছি।

বেশ করেছো আব্বা না হলে আজ তোমাকে আমরা ফিরে পেতাম না। তারপর কি হলো বলো না?

হাঁ বলছি, জানি না রাত না দিন কিছু বুঝতে পারতাম না কারণ আমাকে যেখানে আটক করে রাখা হয়েছিলো সেটা ছিলো মাটির তলায়। বন্দী অবস্থায় হলেও আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাকে সংবাদপত্রও পড়তে দেওয়া হয়েছে। এমন কি দাঁড়ি ছাট্‌বার জন্য ছোট কাঁচি এবং সেভের জন্য সরঞ্জামও দেওয়া হয়েছে।

আব্বা তুমি এত সুবিধায় ছিলে জানলে আমরা তোমার জন্য এতো ভাবতাম না। সত্যি আমরা সবাই তোমার জন্য খুব অশান্তিতে ছিলাম।

তোমাদের সব কথা সংবাদ পত্রে জানতে পারতাম। কিন্তু করবার কোন উপায় ছিলো না। বুঝতে পারতাম না কে বা কারা আমাকে এ ভাবে আটক রেখেছে। আর আমাকে আটকে রেখে কিইবা লাভ তাদের এটাও আমি বুঝতে পারিনি। বুঝলাম দু'সপ্তাহ পর।

হুসনা এবার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—কি বুঝতে পারলে আব্বা?

আমি শুয়ে শুয়ে সংবাদপত্র পড়ছিলাম যেমন অন্যান্য দিন পড়ি। এমন সময় সেই লোকটা যে প্রথম থেকেই আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো সে এসে জানালো—চলুন আপনাকে সর্দার ডাকছেন।

আমি চমকে উঠলাম—সর্দার! কে তোমার সর্দার?

লোকটা বললো—চলুন সাক্ষাতে দেখবেন।

সংবাদপত্র রেখে উঠে পড়লাম।

লোকটা চললো, আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি। বেশ কিছুটা চলার পর একটা লিফ্‌টের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সে। একটা সুইচে চাপ দিতেই—লিফটের দরজা খুলে গেলো, সে আমাকে লিফটে উঠে দাঁড়াতে বললো। আমি লিফটে উঠতেই সেও উঠে দাঁড়ালো; লিফট এবার সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো। মাত্র কয়েক মিনিট, লিফট থেমে গেলো। সে নামলো আমাকেও নামার জন্য বললো। আমি নামতেই পুনরায় সে এগুলো। আমি তাকে অনুসরণ করে একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেই চমকে উঠলাম কারণ দেখলাম জমকালো পোশাক পরা একটি লোক কক্ষ মধ্যে পায়চারী করছে।

আমার সঙ্গী তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। আমি স্থির ভাবে তাকালাম তার দিকে। লোকটির মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচলে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। আমরা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই জমকালো পোশাক পরা লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে তাকালো আমার দিকে,

পা থেকে আমার মাথা অবধি দেখে নিয়ে আমার সংগী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো—রহমান তাহলে ঠিক ভাবেই কাজ করেছো, ভুল করো নি কোন।

আমার সঙ্গীটি জবাব দিলো—হাঁ সর্দার, রহমান লোক চিনতে ভুল করে নি।

এবার জমকালো মূর্তি মুখের কালো আবরণ সরিয়ে ফেললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—মিঃ চৌধুরী?

জমকালো মূর্তি—জবাব দিলো—না দস্যু বনহুর।

আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—তুমি-তুমি তাহলে আমাকে বন্দী করে এনেছো?

দস্যু বনহুর বললো—ঠিক্ আমি নই আমার নির্দেশে আমারই সহচর আপনাকে নিয়ে এসেছে। তবে আপনি বন্দী নন আটক বলতে পারেন। কোন কারণ বশতঃ আপনাকে কিছুদিন আমি আটকে রাখতে চাই।

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে আব্বা? বললো হুসনা।

মিঃ আহসান বললেন—আমি তখন রাগে ক্ষোভে কোন জবাব দেইনি। দস্যু বনহুর আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললো—মিঃ আহসান আপনার কন্যার জীবনের বিনিময়ে আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যা চাইবেন তাই দেবেন।

আমি তখনও কোন জবাব দিলামনা।

বনহুর বললো আবার—জানি, আপনি আপনার কথা রাখতে ইচ্ছুক নন কিন্তু মনে রাখবেন যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের আমি ক্ষমা করিনা আর ক্ষমা করিনা যারা কথা দিয়ে কথা না রাখে। আপনি জানতেও চাইলেননা আমি কি চাই?

তখন কথা না বলে পারলামনা, বললাম—বলো তুমি কি চাও?

বনহুর বললো—হাঁ, এবার ঠিক্ মানুষের মত কথা বলেছেন। শুনুন মিঃ আহসান, হুসনার বাবা বলে আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করি কারণ আপনি আমারও বাপের মত। কিন্তু আপনাকে আমি বারবার বলেছিলাম আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাবেন না। আপনি আমার কথা রাখেননি আমি

সে জন্য দুঃখিত। মিঃ আহসান এ কারণেই আমি আপনাকে আটকে রাখবো এবং আপনার ছদ্মবেশে আমি কিছু কাজ করবো। আমি চাই আপনার সহযোগীতা। বলুন পারবেন? দেবেন আমি যা চাই?

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে আব্বা?

বলেছিলাম—বেশ আমি দেবো। আমার সহযোগীতা পাবে।

বেশ তা হলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। তারপর সে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেই কক্ষ থেকে।

আমি ফিরে এসেছিলাম আমার কক্ষে।

এরপর আর ওর সংগে তোমার দেখা হয়নি আব্বা।

না মা আর তার সংগে দেখা হয়নি।

তোমাকে কে এখানে পৌঁছে দিলো তাও জানোনা?

ঠিক্ জানিনা বললে মিথ্যা বলা হবে তবে এটুকু জানি দস্যু বনহুরেরই কোন বিশ্বস্ত অনুচর আমাকে এখানে রেখে গেছে। জানিস মা ওখানে কত সুখে ছিলাম কত আরামে ছিলাম, ওরা কোন সময় আমার সংগে অসৎ ব্যবহার করেনি।

আব্বা তুমিও কোনদিন ভুল করোনা তোমার শপথের কথা।

কিন্তু তার আগেই যে সে হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী হবে কে জানতো মিঃ আহসান একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন!

❑

কান্তা বার।

কান্দাই শহরের নামকরা চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, এই কান্তা বার। শহরের ধনবান এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিগণই এই বারে আসেন। তারা ইচ্ছা মত আমোদ প্রমোদ করেন তারপর ফিরে যান যে যার বাস ভবনে। কান্তা বার এর প্রধান আকর্ষণ হলো দিপালী নামে একটি তরুণী নর্তকী।

দিপালীর জন্ম কাশ্মীরে।

প্রথমে ওর নাম ছিল মেরিনা পরে ওর নাম হয় দিপালী।

কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁ দেওয়ানী।

বয়স তার পঞ্চাশের বেশি।

এককালে সে কাশ্মীর ব্যবসা করতো।

হিম্মৎ খাঁ যখন কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে আসে তখন তার সংগে ছিলো একটি ছোট মেয়ে নাম তার জেরিনা। আর ছিলো কিছু সোনাদানা।

কান্দাই এসে ছোট একটা হোটেল খুলে বসেছিলো হিম্মৎ খাঁ। মেয়েটাকে নিয়ে বেশ চলছিলো তার! সোনাদানা গোপনে বিক্রি করতো আর হোটেল জেকে বসে থাকতো।

একদিন সেই হিম্মৎ খাঁ কান্তা বার নামে একটি চিত্তবিনোদন কেন্দ্র খুলে বসলো।

তখন দিপালী তরুণী।

লাব্যণ্যময়ী দিপালীর রূপে কান্তাবাবু যেন অপরূপ হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত কান্তা বারে চিত্তমোদিদের ভীড় জমে উঠে। সুরা পান ছাড়াও নাচ গান চলে কান্তা বারে।

নাচনে ওয়ালী দিপালী চান সবাইকে মুগ্ধ করে বিস্মিত করে হতবাক করে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হতেই মুষল ধারে বৃষ্টি নামলো সমস্ত শহরে নেমে এলো এক জমাট নীরবতা।

কান্তাবারের সম্মুখে এসে থামলো একটা গাড়ি। নতুন ঝক ঝকে মডেল কার। কার থেকে নামলেন মিঃ হেলালী। তরুণ পুলিশ সুপারকে একা কান্তাবারে প্রবেশ করতে দেখে অনেকেই অবাক হলেন।

যারা পরিচিত তারা অভিনন্দন জানালো মিঃ হেলালীকে।

মিঃ হেলালীর শরীরে পুলিশের পরিচিত পোশাক নয় সাধারণ স্বাভাবিক মূল্যবান কোট প্যান্ট টাই। বগলে একটা ছোট হান্টার।

বারের অভ্যর্থনাকারী মিঃ হেলালীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলো। ঠিক্ ঐ মুহূর্তে দক্ষিণ পাশের টেবিলে বসা চার জন লোক একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো নিজেদের মধ্যে। মিঃ হেলালীকে দেখে তারা ভীষণ ভাবে আশ্চর্য না হলেও কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারলোনা। কারণ কান্তাবারে পুলিশ সুপার মিঃ হেলালী, বিস্মিত হবার কথাই বটে।

যারা কান্তাবারের দক্ষিণ দিকের আসনে বসেছিলো তারা হলো হিরু বন্দরের অধিবাসী মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে ছিলো এদের কারবার। হিরু বন্দরে এদের বেশ কয়েকটা জাহাজ রয়েছো এই সব জাহাজে কান্দাই থেকে গোপনে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই করে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। ফিরোজ রিজভী এবং তার সহকারীদের নিহত সংবাদে এরা শুধু মর্মাহত হয়নি এদের মাথায় বর্জ্রাঘাত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলতো তাদের রিজভীর সঙ্গে।

এদের নেতার নাম হলো মোসলে উদ্দিন সিরাজী। তার সঙ্গীদের নাম হুমাইয়া, জারু, মহিস উদ্দিন, ফারুক হোসেন। এরা সবাই এসে কান্দাই জড়ো হয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের চোরা চালানী কারবার বাঁচিয়ে রাখা। কারবারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শহরের কিছু সংখ্যক স্বনামধন্য ব্যক্তিদের হাত করতে হবে এবং হাত করতে হবে পুলিশের কর্মকর্তাদের।

মিঃ হেলালীকে এরা চিনতো না কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে শহরে এসেই সর্বপ্রথম পুলিশ কর্মকর্তাদের চিনে নিয়েছেন কোন কৌশলে। তাই আজ মিঃ হেলালীকে চিনতে তাদের মোটেই কষ্ট হয়না। একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো তারপর উঠে দাঁড়ালো ওরা।

মিঃ হেলালী তখন বারের মধ্যভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

দিপালী তাঁকে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অভিনন্দন জানায়। মিঃ হেলালী বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে সত্যি তরুণী সুন্দরী বটে।

ডাগর ডাগর দু'টো চোখ মেলে বলে দিপালী—বাবু কি দেখছো?

মিঃ হেলালী হেসে বলে—তোমাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠে দিপালী—আমি একটা সামান্য নর্তকী। আমাকে তুমি এমন করে দেখছো কেনো বাবু?

না কিছু না চলো।

দিপালী বলে—এসো বাবু।

মিঃ হেলালী এগিয়ে চলেন ওর সঙ্গে।

সুসজ্জিত একটি কক্ষ মধ্যে এসে দাঁড়ালো দিপালী। অপরূপ দেহ ভঙ্গীমায় বললো—বসো।

মিঃ হেলালী বসলেন।

দিপালী ওপাশ থেকে এক বোতল সরাব আর একটি কাঁচ পাত্র এনে রাখলো সম্মুখস্থ টেবিলে। তারপর কাঁচ পাত্রে সরাব ঢেলে বাড়িয়ে ধরলো—নাও।

মিঃ হেলালী কোনদিন সরাব স্পর্শ করে নাই তিনি একটু হক চকিয়ে যান। বলেন—না আমি ওসব খাই না।

দিপালী খিল খিল করে হেসে উঠে—তবে কেনো এসেছো বাবু?

মিঃ হেলালী মৃদু হেসে বললেন—তোমার নাচ দেখতে।

ততক্ষণে মোসলে উদ্দিন সিরাজী তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে বসলো কক্ষ মধ্যে অন্যান্য চেয়ারগুলো দখল করে নিয়ে। তারা আসন গ্রহণ করতেই তাদের সম্মুখে কয়েক বোতল সরাব আর কয়েকটা কাঁচ পাত্র রেখে গেলো একটি বয়।

ওরা সরাব পান করতে করতে বার বার বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন মিঃ হেলালীকে।

দিপালী তার নুপুরে ঝঙ্কার তুলে নাচতে শুরু করলো।

অপরূপ দেহ ভঙ্গীমায় মুগ্ধ হলেন মিঃ হেলালী তিনি এখানে এসেছেন গোপনে সন্ধান নিতে, কারণ মিঃ হেলালী জানতে পেরেছেন কান্তাবারের অভ্যন্তরে চলে নানা রকম অসৎ কর্ম। এখানেই নাকি দুষ্কৃতিকারীদের উৎস।

মিঃ হেলালীর দৃষ্টি দিপালীর দিকে থাকলেও তার লক্ষ্য ছিলো কান্তাবারের চারিদিকে। কোথায় কে কি করছে সব তিনি দেখছিলেন।

মিঃ হেলালী যখন দিপালীর সঙ্গে কান্তা বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিলেন তখন দক্ষিণ পাশের লোকগুরো যে তাকে লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো সেটুকু মিঃ হেলালীর চোখে বাদ যায়নি। তারপর মিঃ হেলালী যখন কক্ষ মধ্যে এসে বসলেন তখন ঐ লোকগুলো যে সেই কক্ষে এসে বসলো তাও তিনি দেখলেন। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দিপালী তখনও নেচে চলেছে।

দিপালীর নুপুর ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে কান্তা বার। আরও অনেক ধনকুবেরু এসে জমায়েত হয়েছে, বিভিন্ন টেবিলের চার পাশ ঘিরে বসেছে সবাই। বয় যার যা প্রয়োজন মত পানিয় পরিবেশন করে চলেছে।

মিঃ হেলালীর সম্মুখে দিপালী হাটু গেড়ে বসে পড়ে, তারপর দু'হাত প্রসারিত করে ধরতে যায় ওর গলা—কিন্তু মিঃ হেলালী দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। দিপালীর নাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো সে কিছু ইংগিৎ করে।

মিঃ হেলালী ঠিক বুঝতে পারেন না।

দিপালী চলে যায় একটু পরে ফিরে আসে। আবার সে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। অদ্ভুত সে নৃত্য ভঙ্গীমা।

নাচতে নাচতে সবার সম্মুখে একটিবার ঝুকে পড়ে সে। এবার দীপালী এসে দাঁড়ায় মিঃ হেলালীর সম্মুখে, অতি সতর্কতার সঙ্গে এক টুকরা কাগজ গুঁজে দেয় সে মিঃ হেলালীর হাতের মুঠায়।

মিঃ হেলালী চমকে উঠলেও নিজকে সংযত করে নেয় সঙ্গে সঙ্গে! পুনরায় আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবার টেবিলের আড়ালে কাগজের টুকরাটা নিয়ে এক নজর দেখে নিলেন। কাগজের টুকরায় লিখা আছে—

কান্তা বার আপনার জন্য নয়। আপনি
এক্ষুণি চলে যান নাইলে বিপদ আসন্ন।

—দিপালী

মিঃ হেলালী চিঠিখানা পড়ে মৃদু হাসলেন তারপর নতুনভাবে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দিপালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো মিঃ হেলালীর মুখের দিকে। এক মুখ ধোয়া তিনি ছুড়ে দিয়ে বললেন—তোমার নাম কি সুন্দরী?

দিপালী। বললো নর্তকী।

বড় সুন্দর নাম।

দিপালীর সঙ্গে যখন মিঃ হেলালী কথা বলছিলেন তখন মোসলে উদ্দিন সিরাজী বেরিয়ে গেলো সবার অলক্ষে যাবার সময় ইঙ্গিৎ করলো সে তার সহকর্মীদের।

দিপালী কিন্তু লক্ষ্য করেছিলো মোসেল উদ্দিনের শয়তানী ভাবসাবটাকে। সে বললেন—না চলে যাবো না সুন্দরী। চলো তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

কিন্তু.....

না কোন কিন্তু নয় চলো। ভিতরে চলো দিপালী।

দিপালীর মুখমণ্ডল কেমন যেন ভয় বিহ্বল মনে হলো তবু সে চললো।

মিঃ হেলালীর মূল উদ্দেশ্য কান্তাবারের সব কিছু তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন।

সেই কক্ষ ত্যাগ করে দিপালী অপর এক কক্ষে এসে পৌছলো। চারদিক দেখে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো—জানিনা আপনি কে। আমি চিনিনা কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে কান্তা বার আপনার জন্য নয়।

আমি জানি, তবু কেনো এসেছি জানো? তোমার সহায়তা পাবো বলে। দিপালী তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

করবো! কিন্তু এখানে আপনি নিরাপদ নন।

জানি।

হাঁ তবু? চলো দিপালী তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে কান্তা বারের সম্মুখে এসে থামলো আর একটি গাড়ি। অদ্ভুত সে গাড়ি খানা, গাড়ির কোন দরজা নাই। ড্রাইভিং আসনের পাশ দিয়ে একটি মাত্র দরজা।

দিপালী বললো—আসুন তবে।

কিন্তু দিপালী পা বাড়ানোর পূর্ব দণ্ডে মিঃ হেলালীর দু'পাশে দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে দাঁড়ালো—তাদের হাতে উদ্যত রিভলভার।

মিঃ হেলালী হঠাৎ চমকে উঠলেন না তিনি তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন, পর মুহূর্তেই পকেট থেকে বের করলেন একটা পিস্তল।

পাশের লোক দু'জনের মধ্যে একজন কৌশলে মিঃ হেলালীর হাতে আঘাত করলো।

মিঃ হেলালীর হাত থেকে পিস্তলটা ছিট্‌কে পড়লো দূরে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হেলালী ঝাপিয়ে পড়লো দুস্কৃতিকারীদের উপর।

শুরু হলো তুমুল লড়াই।

ওরা দু'জন মিঃ হেলালী একা।

দিপালী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, সে নিরুপায়ের মত তাকাতে লাগলো এদিক সেদিক।

ততক্ষণে মিঃ হেলালীকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন গুণ্ডা লোক।

মিঃ হেলালী উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফু দিলেন। তৎক্ষণাত একদল সশস্ত্র পুলিশ প্রবেশ করলো কান্তা বারের অভ্যন্তরে।

কিন্তু তখন মিঃ হেলালীকে ওরা সরিয়ে নিয়েছে। পুলিশ বাহিনী কান্তা বারে প্রবেশ করে মিঃ হেলালীকে খুঁজে পেলোনা।

তখন মিঃ হেলালীর নাকে রুমাল ধরে সরিয়ে ফেলেছে মোসলে উদ্দিনের লোক। একটা লিফ্‌ট নেমে গেছে নিচের দিকে। কান্তা বারের অতল গহ্বরে।

লিফটে সংজ্ঞাহীন মিঃ হেলালীকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ দু'জন লোক।

মোসলে উদ্দিন ও তার অন্যান্য লোকজন সবাই যার যার টেবিলে এসে বসেছে। সবাই সুরা পানে ব্যস্ত হাসি গল্প করছে যেন আপন মনে। একটু পূর্বে এখানে কিছু একটা ঘটে গেছে এমন কিছু বুঝবার জো নাই।

পুলিশ ফোর্স কান্তা বারে প্রবেশ করে এদিক ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দিলো কিন্তু তাদের চোখে এমন কিছু দোষণীয় ব্যাপার ধরা পড়লোনা। সবাই সন্ধান করছে মিঃ হেলালীর।

হিম্মৎ খাঁ বসেছিলো তার বিশ্রামাগারে একজন লোক গিয়ে তার কানে কানে কিছু বললো সঙ্গে সঙ্গে হিম্মৎ খাঁ নেমে এলো নিচে। দিপালী এক পাশে দাঁড়িয়েছিলো।

হিম্মত খাঁ তাকে কিছু ইশারা করলো।

দিপালী অমনি নাচতে শুরু করে দিলো।

যারা বারের অভ্যন্তরে বসে সুরা পানে মত্ত ছিলো দিপালী তাদের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে নাচ পরিবেশন করে চললো। পুলিশ বাহিনী তখন সন্ধান করে ফিরছে কোথায় গেলো মিঃ হেলালী।

অনেক খোঁজাখুজি করেও যখন পুলিশ বাহিনী মিঃ হেলালীর কোন খোঁজ পেলেন না তখন তারা বিফল মনোরথে ফিরে চললো।

মোসলে উদ্দিন এবং হিম্মত খাঁ একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

দিপালীর চোখ এড়ালোনা এ দৃশ্য। সে সব জানে কান্তা বারের অভ্যন্তরে সব কাহিনী সে জানে। কত শত শত মহৎ ব্যক্তিকে এই কান্তা বার সর্ব শান্ত করে দিয়েছে। কত লোকের বুকের রক্ত আজও কান্তা বারের কোন এক গোপন কক্ষে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। দিপালী এর কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা কারণ তারই পিতা এই কান্তা বারের মালিক এবং তারই দ্বারা এ সব কুকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কান্দাই এর বহু সোনা দানা আর মূল্যবান সামগ্রী চোরা চালানী হয়ে চলে যাচ্ছে এদেশ থেকে দূরে বহু দূরে। শুধু তাই নয় প্রচুর খাদ্যশস্যও গোপনে চালান হচ্ছে এই কান্তাবারের সহযোগীতায়। কান্তা বার হলো চোরাচালানী আর দুস্কৃতিকারীদের আড্ডা স্থল।

দিপালী সব দেখে সব বুঝে তবু বলবার কিছু নেই, যদিও ওর মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে বড় হবার পর থেকে হিম্মত খাঁকেই পিতা বলে চিনেছে কাজেই পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা ওর বিবেকে বাধে।

নীরবে সব দেখে যায় দিপালী।

মন যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠে তখন কান্তা বারের তিন তলার ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয় সে। অসংখ্য তারার প্রদীপ তাকে হাত ছাড়ি দিয়ে ডাকে, এসোত দিপালী তুমিও এসো আমাদের পাশে। দিপালীর মন চায় ঐ অসংখ্য তারার পাশে গিয়ে সেও জ্বলবে। পৃথিবীর মানুষ তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু স্পর্শ করতে পারবেনা।

দিপালীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু। কোথায় যেন তার ব্যথা, কিসের যেন অভাব নিজেই তা বুঝতে পারেনা। ছোট থেকে এই বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আজও সে একটি দিনের জন্য তৃপ্তি বা শান্তি পায়নি।

হিম্মৎ খাঁর আদর যত্ন তাকে পিতার নিবিড় স্নেহ দিতে পারেনি কোথায় কিসের যেন অভাব সদা সর্বদা তার মনকে বিষণ্ন করে রেখেছে।

হিম্মৎ খাঁ দিপালীকে তার বারের প্রধান অলংকার মনে করে আদর যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই তবু দিপালী নিজকে অসহায় মনে করতো। প্রতিদিন নিত্য নতুন মানুষের মন তুষ্ট করার জন্য তাকে নানা ভাবে প্রস্তুতি নিতে হতো। এ সব শিক্ষা লাভ করেছে সে-হিম্মৎ খাঁর কাছ থেকে।

মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজে পায় নি। কোথায় যাবে সে, কে দেবে তাকে আশ্রয়। যদি এখন থেকে পালিয়ে সে চলে যায়, সেখানেও যদি তার ভাগ্য তাকে অনুসরণ করে। তাই দিপালী পালাতে পারে নি।

দিপালী জানে শহরের কারা দুস্কৃতিকারী। কারণ কান্তা বারেই যে দুস্কৃতিকারীদের মিলন ক্ষেত্র। দিপালী এদের সন্ধান জানে আরও জানে কারা কেমন লোক। কে কি কাজ করে তাও সে জানে। তারই সম্মুখে দুস্কৃতিকারীগণ তাদের গোপন আলোচনা চালায় দিপালী তখন না বোঝার মত ভান করে হয় সরাব পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকে নয় নৃত্য পরিবেশন করে চলে।

মিঃ হেলালীকে দিপালী চিনতে পারেনি কারণ তাকে কোন দিন দেখেনি কাজেই সে জানে না কে তিনি। কান্তা বারে নিত্য নতুন মুখের আমদানী হয়। মিঃ হেলালীকেও সে তেমনি একজন লোক মনে করেছিলো।

মিঃ হেলালী কান্তা বারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কান্তাবারের দক্ষিন দিকের আসনে বসা লোকগুলোর মুখোভাব দিপালীকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। দিপালী বুঝতে পেরেছিলো এই ব্যক্তি সামান্য কেউ নন নিশ্চয়ই এমন কোন এক লোক যাকে দেখে মোসলেম উদ্দিন ও তার দল বল চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো।

দিপালী তাই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো কান্তা বারের অভ্যন্তরে এবং নৃত্যের ছলনায় তাকে কান্তা বার ত্যাগ করবার জন্য বার বার ইংগিত করেছিলো।

মিঃ হেলালী দিপালীর ইংগিত বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করেছিলেন কারণ তিনি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা তাঁকে করতেই হবে। তিনি গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলেন কান্তাবারের অভ্যন্তরে চলেছে নানা রকম অসৎ কাজ এবং এখানেই তিনি সন্ধান পাবেন দুস্কৃতিকারীগণের। যারা দিনের পর দিন অসৎ উপায়ে চোরাকারবার চালিয়ে চলেছে। মিঃ হেলালী একা আসে নি এসেছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে। এদের তিনি কান্তা বারের বাহিরে আত্মগোপন করতে বলে নিজে ছদ্ম বেশে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন মিঃ হেলালী পুলিশ বাহিনীকে জানিয়ে রেখেছিলেন। ভিতরে যদি তেমন কিছু পরিলক্ষিত হয়, যদি তিনি দুস্কৃতিকারীদের সন্ধান পান তাহলে হুইসেলের শব্দ করলেই তারা যেন দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করে।

পুলিশ বাহিনী মিঃ হেলালীর কথা মত প্রস্তুত হয়েই ছিলো, হুইসেলের শব্দ শোনা মাত্র ভিতরে প্রবেশ করে এলোপাথারী খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী বিফল হলো। কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও মিঃ হেলালীর কোন সন্ধান তারা জানতে পারলোনা।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই পুলিশ মহলে ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ প্রধান জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন।

মিঃ হেলালী অকস্মাৎ উধাও। তিনি কোথায় গেলেন কেউ বলতে পারে না।

মিঃ জায়েদী দল বল নিয়ে কান্তা বারে এসে হাজির হলেন। নানাভাবে খানা তল্লাশী চালিয়ে কোন রকম সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলেন না।

হিম্মৎ খাঁ পুলিশ কর্মকর্তাগণকে আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ করে দিলেন।

মিঃ হেলালী বা কোন পুলিশ অফিসার সেখানে গিয়েছে বলে তারা জানে না। এমন কি সেখানে গিয়ে মিঃ জায়েদীর সঙ্গে সরকার পক্ষের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ ঘটলো যারা এখন দেশ ও দশের মহান নেতা।

অবশ্য এই নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিদের আনাগোনা এখানে প্রকাশ্যে ছিলো না এরা গোপানে আসা যাওয়া করতো। মিঃ জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ অকস্মাৎ গিয়ে হাজির হওয়ায় তাদের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়। এতে মহামান্য অতিথিবৃন্দ লজ্জাবোধ না করে পুলিশ প্রধানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান।

মিঃ জায়েদী ও তার সহকর্মী পুলিশ অফিসারগণ দেশের মহান নেতাদের কান্তা বারে দেখে হক চকিয়ে না গেলেও নিজেরা একটু বিব্রত বোধ করেন এবং সেখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা চালান।

মিঃ জায়েদীও বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা বা সন্ধান চালানো প্রয়োজন বোধ করলেন না কারণ দেশের সরকার পক্ষের লোকই এ কান্তা বারের খদ্দের জেনে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

মিঃ জায়েদী দলবল সহ বিদায় নিতেই কান্দাই-এর খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের সহকারী মীর্জা মোহাম্মদ হাই তুলে বললেন—হিম্মৎ খাঁ দেখলেন।

হিম্মৎ খাঁ বললেন—হাঁ দেখলাম।

মীর্জা মোহম্মদ ব্যাঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললেন—যত সব অপদার্থ।

হিম্মৎ খাঁ সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো—স্যার নিন।

মীর্জা মোহম্মদ বার বার হাই তুলছিলেন কেনো না সরাবের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো। তিনি হলেন কিনা সরকার বাহাদুরের খাদ্য মন্ত্রীর প্রধান সহকর্মী মীর্জা মোহাম্মদ। তার সম্মান কম নয়, কান্দাই এর প্রায় গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করেন। হিম্মৎ খাঁ সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন—মিঃ হেলালীর সন্ধানে এসেছে কান্তা বারে। মিঃ হেলালী কি এখানে আসার যোগ্য মানুষ? তিনি হলেন কিনা একটা.....থেমে গেলেন মীর্জা মোহম্মদ।

আর আর যারা তখন উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে যারা ছিলেন এদের নাম দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান, হাসান কাদেরী।

এরা সবাই মীর্জা মোহাম্মদকে সমীহ করে শ্রদ্ধা করে। কারণ খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের প্রধান সহকর্মী হলেন তিনি। দেশ ও দশের ভবিষ্যৎ বলা চলে।

কান্দাই এর প্রেসিডেন্ট আবু গাওসার হলেন সত্যিকারের মহান এবং মহৎ ব্যক্তি তিনি চান দেশ ও দশের মঙ্গল কিন্তু তার দক্ষিণ ও বাম হস্ত যারা তারাই হলেন এই নেতৃস্থানীয় দল যারা অসৎ কর্মের শিরমণি। এরা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি সেজে অন্যায় অনাচার চালিয়ে চলেছে। দেশের দ্রব্য মূল্য অগ্নি সম হলেও এদের তেমন কিছু যায় আসেনা কারণ এদের তো আর পয়সার অভাব নেই। দেশের যারা অসৎ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কাজেই পয়সা আপনা আপনি এসে যায় হাতের মুঠায় ঠিক ভোজ বাজীর মত।

আজ মিঃ জায়েদীর সঙ্গে কান্তা বারে যাদের দেখা হলো তারা সবাই সম্মানিত জন কাজেই মিঃ জায়েদী বা তার দলবল চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মীর্জা মোহাম্মদের কথায় দেওয়ান রাব্বী বললেন—ঠিক্ বলেছেন স্যার মিঃ হেলালী হলেন একজন নিরস পুলিশ সুপার। কোনদিন তাকে কোন পার্টি বা ফাংশানে দেখা যায় না।

গোলাম সোবহান বললেন—তরুণ পুলিশ সুপার কিনা তাই নাম কেনার জন্য ব্যস্ত।

হাসান কাদেরী তার ফ্রেন্স কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—যত সব হুজুবুদ্ধ এরা কি যে দেশের কাজ করবে একেবারে সব গোবরে গাধা। স্যার এরা দেশের কোন কাজে আসে না। যা করছি তা আমরাই.....কথাগুলো শেষ করেই ঢক্ ঢক্ করে কিছুটা সরাব গলধঃকরণ করে নেয়।

মীর্জা মোহাম্মদ জড়িত কণ্ঠে বলেন—চলুন এবার উঠা যাক।

স্যার দিপালীর নাচ যে এখনও দেখা হয়নি? বললো দেওয়ান রাব্বী।

মীর্জা মোহাম্মদের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—তাই তো। —হিম্মৎ খাঁ?

বলুন মালিক? হিম্মৎ মিনতী ভরা কণ্ঠে বললো।

মীর্জা মোহম্মদ ইংগিত করলেন কিছু।

হিম্মৎ খাঁ হাতে তালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি বেয়ে নেমে এলো দিপালী।

হিম্মৎ খাঁ তাকে লক্ষ্য করে বললো—নাচো।

দিপালীর ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেলো। একবার সে ঐ মহামান্য অথিতিদের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর অনিচ্ছা সত্যেও নাচতে শুরু করলো।

এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো নতুন ঝক ঝকে টয়োটা কার। কার থেকে নামলো একটি যুবক, শরীরে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ। যুবক কান্তা বারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

হিম্মৎ খাঁ শসব্যস্তে এগিয়ে এসে নত হয়ে অভিবাদন করলো—ইনি জাংহার রাজকুমার জ্যোতির্ময়।

মীর্জা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী সাথীগণ স্বসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে করমর্দন করলেন।

মীর্জা মোহম্মদ বললো—সৌভাগ্য তাই আজ আপনার সংগে সাক্ষাৎ লাভ ঘটলো। এতোদিন শুধু আপনার নাম শুনে এসেছি-----

রাজকুমার জ্যোতির্ময় একটু হাসলো মাত্র।

দিপালী কিন্তু তখনও নেচে চলেছে।

নৃত্যের তালে জ্যোতির্ময়ের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো দিপালী। বিস্ময় ভরা চোখে সে দেখে নিলো ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারপর পুনরায় সে নাচতে শুরু করলো—অপূর্ব সে নাচ।

জ্যোতির্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দিপালীর দিকে। কোনদিন সে কান্তা বারে আসেনি এটাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

হিম্মৎ খাঁর দু'চোখে আনন্দের উৎস।

তারই নির্দেশ মত নানা রকম খাবারের সঙ্গে এলো মূল্যবান সরাবের বোতল।

মীর্জা মোহাম্মদ এবং তার সহচরগণও জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে মিশে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠেলেন।

কুমার জ্যোতির্ময় কোনদিন সরাব পান করেনি সে অল্পক্ষণে নেশায় আত্মহারা হয়ে পড়লো। পকেট থেকে টাকার গাদা গাদা নোট বের করে টেবিলে ছুড়ে দিতে লাগলো।

হিম্মৎ খাঁ দু'হাতে নোটগুলো জড়ো করে নিয়ে পকেটে রাখতে লাগলো।

তার কান্তা বারে প্রতিদিন শতশত ধনকুবেরদের আনাগোনা হয়ে থাকে কিন্তু এমন অদ্ভুত লোক সে কোনদিন দেখেনি। এতো টাকা, দু'চোখে যেন সে সর্ষেফুল দেখছে। দিপালী এতোক্ষণ বোতল থেকে সরাব ঢেলে পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছিলো, তারও চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বিস্ময়ে।

মীর্জা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীগণও হতবাক হয়ে গেছে।

❑

দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে দু'জন লোক মিঃ হেলালীর সংজ্ঞাহীন দেহটা বয়ে নিয়ে চলেছে। এরা দু'জন মোসলে উদ্দিনের লোক। অসীম শক্তিশালী এরা তাতে কোন সন্দেহ নাই। এদের এক জনের নাম জারু অপর জনের নাম ফারুক হোসেন।

এরা মিঃ হেলালীকে যখন বয়ে নিয়ে চলেছে তখন মোসলে উদ্দিন, হুমাইয়া ও মহিসাদ্দিন ফিরে আসে কান্তা বারে। কারণ তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলে বাইরে অদ্ভুত ধরণের দরজা বিহীন একটি গাড়ি। ঐ গাড়িতে চালান যাবে মূল্যবান সামগ্রী যা কান্দাই জনগণের রক্ত নিংরিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

হিম্মৎ খাঁর সহযোগীতায় মোসলে উদ্দিন এবার তার ব্যবসা জেকে বসেছে। শুধু মোসলে উদ্দিন নয় এমনি বহু চোরাকারবারী শহরের বিভিন্ন স্থানে আড্ডা পেড়ে কাজ করেছে। যারা চোরাচালানী এবং দুস্কৃতিকারী এদের সবার সংগে যোগাযোগ আছে হিম্মৎ খাঁর।

দিপালী এদের সবার সংবাদ জানে, কে কোথায় থাকে তাও জানে সে কারণ কৌশলে দিপালী সবার ঠিকানা সংগ্রহ করে রেখেছে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়।

মোসলে উদ্দিন এবং তার সহকারীদল প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলো কারণ ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের নিহত সংবাদ তাকে শুধু বিচলিতই করেনি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলো সে। কারণ তার ব্যবসার প্রথম পার্টনার ছিলো রিজভী। তারপর যখন শুনেছিলো দস্যু বনহুর তাদের হত্যা করেছে তখন তার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিলো। সে মুহূর্তে তার আসে পাশে যারা ছিলো তারা কোনদিন ভুলবেনা মোসলে উদ্দিনের তখনকার মুখ ভাব। সে এক বিকৃত ভয় কাতর বীভৎস চেহারা।

মোসলে উদ্দিন মাথায় করাঘাত করেছিলো সেদিন গোপনে গোপনে, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সংবাদটা তার মৃতবৎ দেহে প্রাণের সঞ্চার এনেছিলো।

মোসলে উদ্দিন পুলিশ বাহিনীদের তোয়াক্কা করেনা শিউরে উঠেছিলো সে দস্যু বনহুরের নাম শুনে তারপর তার গ্রেপ্তারের কথা তাকে অসীম সাহসী করে তুলেছিলো। বেরিয়ে এসেছিলো সে তার গোপন আস্তানা থেকে। সুদুর কান্দাই শহরে এসে আবার সে ব্যবসা কেন্দ্রগুলোকে জাকিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে চলে ছিলো। ।

হিম্মৎ খাঁ তাকে সহযোগীতা চালিয়ে এসেছে প্রথম থেকেই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু মোসলে উদ্দিন নয় চোরাকারবারীদের সঙ্গে শহরের যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যোগাযোগ রয়েছে তাদের সবার সঙ্গেই যোগ সূত্র রয়েছে হিম্মৎ খাঁর।

ফিরুজা বন্দরের নিকটে ছিলো দিরু ফার্ম, ফিরোজ রিজভীর প্রধান এবং প্রকাশ্য ব্যবসা কেন্দ্র স্থল। ফিরোজ রিজভী ও তার দলবল নিহত হবার পর দিরু ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ্যে বন্ধ হলেও আসলে দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে একটি গোপন আড্ডাখানা ছিলো। যেখানে আত্মগোপন করে সলাপরামর্শ করতো শহরের জাঁদরেল দুস্কৃতিকারী দল এবং বেশ কিছু কক্ষে চোরা মাল এরা গুদামজাত করে রাখতো তারপর রাতের অন্ধকারে পাচার করতো ফিরুজা বন্দরে তারপর সেখান থেকে সব মাল চালান হতো জাহাজে দেশের বাইরে।

দরজাবিহীন গাড়িতে মাল বোঝাই করে চালান দিলো মোসলে উদ্দিন দিরু ফার্ম উদ্দেশ্যে।

গাড়ি বিদায় করে পুনরায় ফিরে গেলো যে সুড়ঙ্গ পথে সেখানে মিঃ হেলালীকে এনে বন্দী করে রাখা হয়ছে।

মিঃ হেলালীর সবেমাত্র সংজ্ঞা ফিরে এসেছে তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন একটি আধো অন্ধকারময় কক্ষে তিনি শুয়ে আছেন। স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন তিনি কোথায়। মনে পড়লো সব কথা, মিঃ হেলালী দাঁতে অধর চেপে ধরে নিজকে সংযত করে নিলেন। বুঝতে পারলেন তিনি এখন বন্দী। কান্তা বারের তলদেশে যে কোন এক অন্ধ গহ্বরে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। জীবনে এই তার প্রথম পরাজয়।

হঠাৎ শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী উঠে বসলেন, দেখতে পেলেন দু'জন লোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো।

আধো অন্ধকার হলেও তিনি চিনতে পারলেন এই লোক দু'জনাকে কান্তা বারে দেখেছেন। মিঃ হেলালী কোন কথা না বলে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

লোক দু'জনের একজন হলো মোসলে উদ্দিন অপরজন হলো দেওয়ান রাব্বী।

এরা দু'জন এসে দাঁড়ালো মিঃ হেলালীর সম্মুখে। বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বললো মোসলে উদ্দিন—মিঃ হেলালী সাহেব ঘুঘু দেখেছিলেন ফাঁদ দেখেননি। এবার ফাঁদ দেখুন। বলুন কেনো এসেছিলেন কান্তা বারে?

মিঃ হেলালীর মুখ মন্ডল কালো হয়ে উঠলো। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হলো তার। তিনি দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রয়োজন বোধে এসেছিলাম।

হাঃ হাঃ হাঃ প্রয়োজন? কান্তা বারে পুলিশ সুপারের প্রয়োজন। কি প্রয়োজন এখানে জানতে পারি কি?

মিঃ হেলালী কোন কথা বললেন না।

মোসলে উদ্দিনই বললো আবার—সুন্দরী দিপালীর লোভে না কান্তা বারের গোপন তত্ব সংগ্রহ করতে?

এবার মিঃ হেলালী কথা বললেন—তোমার শেষের কথাটাই ঠিক মনে রেখো এবং তা সংগ্রহ করা আমার হয়ে গেছে।

তাই নাকি! কিন্তু কান্তা বারের গোপন তত্ব সংগ্রহ করে কি লাভ আপনার। কোনদিন আপনি এই ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পাবেন না।

মিঃ হেলালী রাগে ক্ষোভে নীরব রইলেন। কোন কথা তিনি বলতে পারলেন না।

এমন সময় এলো কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁ। মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু তার চোখ দুটো। এসে মিঃ হেলালীকে লক্ষ করে বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বললো—কি পুলিশ সুপার? কেনো এসেছিলেন?

মিঃ হেলালী কোন জবাব দিলেন না, জবাব দিলো মোসলে উদ্দিন—এসেছিলেন কান্তা বারের গোপন তত্ব জানতে কিন্তু.....

বলো থামলে কেনো? বললো হিম্মৎ খাঁ।

মোসলে উদ্দিন তার বাকি কথা শেষ করলো—কিন্তু উনি আটকে গেলেন ফাঁদে বুঝলে হিম্মৎ খাঁ।

বুঝেছি! যাক্ এখন আমাদের কর্তব্য কি বলো? ওকে আটকে রাখবে না খতম করে দেবে?

যেটা তুমি ভাল বোঝ। তবে আমার মনে হয় আটকে রাখাই ভাল যদি এমন কোন সুযোগ আসে লাখ রুপিয়া যদি পাও।

আরে ছোঃ লাখ রুপিয়া! রেখে দাও তোমার লাখ রুপিয়া। কাল কেউটেকে কোনদিন জিইয়ে রাখতে নাই। হঠাৎ কোন সুযোগে ছোবল মারবে কে জানে।

মিঃ হেলালীর অসহ্য যন্ত্রনা বোধ হচ্ছিলো। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা, পিপাসায় কণ্ঠ নালী শুকিয়ে গেছে। কতক্ষণ যে তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন নিজেই জানেন না। ওদের কথাগুলো তার শরীরে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিলো।

মোসলে উদ্দিনের সঙ্গী দেওয়ান রাব্বী হেসে বললো—বিষ দাঁত ভেংগে দিলে আর ছোবল মারতে পারবে না। একে হত্যা না করে বন্দী করে রাখাই শ্রেয় কারণ ভবিষ্যতে কোন কাজে আসবে।

হিম্মৎ খাঁ বললো—হাঁ ঠিক বলেছো ভায়া। ব্যবসা চালাতে গেলে কখন কি দরকার হয় বলা যায়না। পুলিশ মহল তো সব হুজুবুদ্ধ, ওদের সম্মুখে যা পড়ে তাই, পিছন দিয়ে হাতী গেলেও ওরা টের পায়না। কতদিন হলো আমরা কারবার চালিয়ে যাচ্ছি কেই নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচি করেছিলো? দেখেও ওরা না দেখার ভান করে তার মানে ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় তার মানে কেনো হয়রানি হতে যাবে। চোরামাল ধরা পড়লেই তো আবার নাও ঠেলা তাই.....

বলে উঠে দেওয়ান রাব্বী—এতো বুঝেও তো মিঃ হেলালী সাহেব উঠে পড়ে আমাদের পিছু লেগেছিলেন এবার তাই বুঝুন মজাটা। কি হেলালী সাহে কথা বলছেন না কেনো?

বলে উঠলো মোসলে উদ্দিন—দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে এবার কোন বেটাকে আমরা কেয়ার করিনা। যত অনাসৃষ্টির মূলে ছিলো ঐ বেটা.....

এমন সময় একজন লোক এসে হিম্মৎ খাঁর কানে কানে কিছু বললো।

সংগে সংগে হিম্মৎ খাঁ তার সংগীদের কানে মুখ নিয়ে কিছু বলতেই সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলো।

তবে মিঃ হেলালীর কানে এলো "রাজা কুমার জ্যোতির্ময়" শব্দটা তবু কতকটা অস্পষ্ট ভাবে।

ওরা চলে গেলো।

মিঃ হেলালী বার দুই ঐ নামটা মনে মনে স্মরণ করে নিলো রাজ কুমার জ্যোতির্ময় কিন্তু কে সে আর কান্তা বারের সংগে কি সম্বন্ধ। আর এদের সংগেই বা কি তার যোগাযোগ।

হঠাৎ মনে পড়ে জাংহার রাজ কুমারের নাম জ্যোতির্ময়। তবে কি রাজ কুমার-জ্যোতির্ময় কান্দাই এসেছে? হয় তো তাই হবে কিন্তু কান্তা বারে কেনো সে?

মিঃ হেলালী তাকে দেখেনি কিন্তু তার সম্বন্ধে জানেন তিনি। জ্যোতির্ময় বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে কিছুদিন হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেদিন জাংহায় মহা উৎসবের আয়োজন হয়েছিলো। বহুদূর দূরদেশ থেকে রাজা মহারাজা এবং মহারথীগণ এসেছিলেন জাংহায়। বনহুর দীন দুঃখীদের মধ্যে টাকা পয়সা বিতরণ করা হয়েছিলো সেদিন এ সব কান্দাইবাসীদের অজানা নেই।

নিশ্চয় জ্যোতির্ময় এসেছে কান্তা বারে। হয়তো তাকেও বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে...

মিঃ হেলালী ভেবে চলেছেন।

ওদিকে সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে হিম্মৎ খাঁ, মোসলে উদ্দিন, দেওয়ান রাব্বী। এরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে কান্তা বারে এসে পৌছায় ওরা।

জ্যোতির্ময় তখন কান্তাবারের অভ্যন্তরে একটি আসনে বসে আছে হেলান দিয়ে।

সম্মুখস্থ টেবিলে মূল্যবান সরাবের বোতল কাঁচ পাত্র এবং নানা রকম খাদ্য সম্ভার রয়েছে।

দিপালী নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে।

জ্যোতির্ময় এর দু'চোখে বিস্ময়, সে স্থির নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দিপালীকে।

এমন সময় হিম্মৎ খাঁ ও মোসলে উদ্দিন এসে অভিবাদন জানালো জ্যোতির্ময়কে।

জ্যোতির্ময় হেসে অভিবাদন গ্রহণ করলো।

দেওয়ান রাব্বী চলে গেলো ভিন্ন পথে।

মোসলে উদ্দিন ও হিম্মৎ খাঁ এসে বসলো জ্যোতির্ময়ের দু'পাশে।

ততক্ষণে দিপালীর নাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে চলে যায় কান্তা বারের অভ্যন্তরে।

জ্যোতির্ময়ের সম্মুখস্থ পান পাত্র থেকে সরাব পান করে চললো—মোসলে উদ্দিন। হিম্মৎ খাঁ ও তার সঙ্গে যোগ দিলো।

হিম্মৎ খাঁ এক সময় বললো—কুমার বাহাদুর আজ রাত্রি এই কান্তা বারে কাটাবেন বলে আশা করি। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলো দিপালী, শিউরে উঠলো সে।

জ্যোতির্ময় রাজি হয়ে গেলো।

❑

অনেক রাত।

সমস্ত কান্তা বার নীরব নিঝুম।

কান্তা বারের সম্মুখে পার্ক করা গাড়িগুলো রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে সরে পড়েছে। যে দু'এক খানা ছিলো তাও এখন নেই।

শুধু একটি নতুন ঝকঝকে ধূসর রং এর টয়োটা গাড়ি এখনও কান্তা বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িখানা জ্যোতির্ময় এর কারণ সে কান্তা বার থেকে চলে যায়নি। জ্যোতির্ময় যে কক্ষে রয়েছে সে কক্ষ অদ্ভুতভাবে সাজানো। নীলাভো আলো জ্বলছে। ঝেলকুনিতে আলোর ঝাড় ঝুলছে।

নেশা জড়িত ঢুলু ঢুলু চোখে জ্যোতির্ময় উঠে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ করবার জন্য পা বাড়াতেই দিপালী প্রবেশ করলো অতি সন্তর্পণে।

জ্যোতির্ময় বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি!

হাঁ কুমার, আমি।

কি চাও?

কিছুনা।

তবে, কেনো এলে?

কুমার?

বলো!

কান্তা বারে আপনি আর আসবেন না।

কুমার জ্যোতির্ময় খপ করে ধরে ফেললো ওর একটি হাত— কেনো বলোতো?

এখানে বিপদ আছে।

বিপদ!

হাঁ।

দিপালী, আমি এখানে কেনো আসি জানো।

না। আপনি বসুন কুমার কারণ বেশি নেশা পান করায় আপনার দেহ টলছে।

বসবো?

হঁ বসুন। দিপালী জ্যোতির্ময়ের হাত ধরে বসিয়ে দেয় তার বিছানায়।

বলে এবার জ্যোতির্ময়—দিপালী জানো কেনো আসি?

বললাম তো জানিনা।

তোমার মোহ আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সত্যি দিপালী তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি ঐ দিন আমি আত্মহারা হয়ে গেছি। কি অমন করে কি

দেখছো? বুঝেছি ভাবছো এমনি করে আরও কত জনা বলে বা বলেছে এই তো। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি ঐদিনই মন প্রাণে তোমাকে ভালবেসেছি। দিপালী, বলো তুমি আমায় ভালবাসতে পারোনা?

দিপালীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়েত লাগলো ফোট ফোটা অশ্রু। সে জীবনে বহু লোকের সান্নিধ্যে এসেছে, বহু কণ্ঠের আবেগ ভরা সুর তাকে অভিভূত করেছে কিন্তু এমন অন্তস্পর্শী কণ্ঠস্বর সে শোনেনি কোন দিন। দিপালী বলে উঠে—আমি যে অস্পৃশ্য।

হোক—তুমি হিন্দু আমিও তাই। তুমি মানুষ আমিও মানুষ। তুমি নারী আমি পুরুষ উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন।

কিন্তু...

কোন কিন্তু নয় দিপালী আমি তোমায় বিয়ে করবো।

কুমার।

হাঁ।

তা হয়না, আমি একজন নর্তকী...

মানিনা আমি সমাজের কোন কুসংস্কার। দিপালী আমি যদি তোমায় গ্রহণ করি কেউ বাধা দেবেনা। কারণ আমি এখন জাংহার অধিপতি।

শুনেছি আপনার পিতা.....

না তিনি বেঁচে নাই।

কুমার আপনি এ সব কি বলছেন?

যা বলছি সত্য। এবং সেই কারণে আমার আজ কান্তা বারে রাত্রি যাপন।

কুমার।

তুমি অমত করোনা দিপালী। জ্যোতির্ময় ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চেপে ধরলো দিপালীর একখানা হাত।

দিপালী নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে রাজ কুমার জ্যোতির্ময়ের মুখে। নীলাভ আলোতে ঝলমল করছে কক্ষের বেলোয়ারীর ঝাড়গুলো। দেয়ালের

ছবিগুলোকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। ফুল দানী থেকে সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা পূর্ণ পরিবেশ।

দিপালী রাজ কুমার জ্যোতির্ময়ের জন্য এই কক্ষটি আজ মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছিলো।

কাশ্মীরী কন্যা দিপালীর মন রুক্ষ কঠিন ছিলো না। কোমল নারী হৃদয়ের অপূর্ব সংযোজন ছিলো তার মনে। রাজ কুমার জ্যোতির্ময়কে যেমন দিপালীর অপরূপ সৌন্দর্য মোহগ্রস্থ করেছিলো ঠিক দিপালীও সেদিন রাজ কুমার জ্যোতির্ময়কে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো।

উভয়ের মধ্যে যদিও আকাশ পাতাল প্রভেদ তবু নিজের অজ্ঞান্তে দুজনা উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করে ছিলো মনে মনে।

রাজকুমারও তাকিয়ে আছে দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালী ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ এমন সময় একটা বাদ্য যন্ত্রের তীব্র আওয়াজ কানে আসে।

কোন রাজপথ থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। ক্রমান্বয়ে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

দিপালী বললো—কোন বিবাহ উৎসব হবে।

জ্যোতির্ময় বললো—দিপালী তুমি জানোনা আজ শহরের কোন কোন স্থানে আনন্দ উৎসব হচ্ছে।

কিসের আনন্দ উৎসব রাজ কুমার?

তুমি তাহলে শোননি দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় সুধি সমাজের মুখে হাসি ফুটেছে তাই তারা আজ আনন্দ উৎসব করছে।

শুনেছি! শুকনো মুখে উত্তর দিলো দিপালী।

জ্যোতির্ময় বললো—হঠাৎ অমন বিমর্ষ হলে কেন?

রাজ কুমার আপনি সুখী মানুষ বুঝবেন না কিছু। যাই এবার কেমন?

না, এসোছা যখন তখন প্রভাত পর্যন্ত তুমি থাকবে আমার পাশে।

আপনি ভুল করছেন রাজ কুমার।

কেন?

কান্তা বার আপনার জন্য নয়।

জানি আমি জানি বলেই এসেছি। দিপালী এই কান্তা বার তোমার জন্য ও নয়।

কুমার।

হাঁ, বলেছি এ কান্তা বার থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো।

রাজ কুমার সত্যি?

হাঁ সত্যি। শোন কান্দাই দিপালী উৎসবে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। রং এল রংএ সেদিন তোমার আসল রূপ ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো তবু আমি দেখেছিলাম তোমার ঐ নীল দুটি চোখে অপূর্ব এক ভাবের উন্মেষ। আমি দূর থেকে তোমাকে দেখেছিলাম।

দিপালী উৎসব?

হাঁ, আরও অনেক মেয়েদের সঙ্গে তুমিও গিয়েছিলে শহরের আলোক সজ্জা দেখতে। রং এর ফুলঝুরি ছিলো তোমাদের সবার হাতে। তোমরা নিজেরা নিজেরাই রং নিয়ে খেলছিলে ঠিক হোলিখেলার মত। তোমাদের সঙ্গে কতকগুলো ধনকুবেরু ছিলো—তারা তোমাদের দেহে রং ছিটিয়ে একাকার করে দিচ্ছিলো। অন্যান্য মেয়েরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো কিন্তু তুমি, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিলো তুমি মোটেই এতে খুশি ছিলেন। তোমার চোখে ফুটে উঠেছিলো এক অসহায় নিঃসঙ্গতার আভাষ। দিপালী বলো তুমি কি তোমার এ জীবনের জন্য খুশি নও?

বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, আমার এ জীবনের জন্য আমি একটুও খুশি নই।

আমি বুঝতে পেরেছি তাই.....

তুমি উদ্ধার করবে আমাকে এই পাপ পুরী থেকে।

যদি চাও সেই জীবন.....

চাই, আমি বাঁচতে চাই এখান থেকে। .....দিপালীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে বলে—দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় দেশের নর পশুর দল খুশি হয়েছে। কেউ তাদের মন্দ কাজে বাধা দিতে

আসবে না আর যেমন কান্তা বারের অভ্যন্তরে কত কুকর্ম চলেছে কে তার হিসাব রাখে। যাক কুমার যদি আপনি জানতেন তবে কোনদিন এখানে আসতেন না এখানে যারা আসে তারাই শয়তান নরপশু।

আচ্ছা দিপালী একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো।

বলুন?

একদিন যাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে এরা ছাড়া নতুন কেউ আসেনা কান্তা বারে, যেমন আমি নতুন এসেছি।

হাঁ আসে, কিন্তু সবার কথা কি আর মনে থাকে। রাজকুমার সেদিন এক ভদ্র যুবক এসেছিলেন সত্যি তার জন্য আমার দুঃখ হয়।

কেনো?

নানা এ কথা বলা চলবেনা।

দিপালী তুমি বিশ্বাস করো আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করছো?

না।

তবে বলতে এতো বাধা কেনো?

আজ থেকে কিছুদিন আগের কথা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কান্তা বার সরগরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় কান্তা বারে এলো এক যুবক জানিনা কে সে, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে কান্তাবারের পুরোন খদ্দের মোসলে উদ্দিন ও তার সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো। আর কেউ লক্ষ্য না করলেও আমি লক্ষ্য করলাম এবং মনে মনে শিউরে উঠলাম কান্তা বারে কোন নতুন অতিথি এলে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব ছিলো আমার। আমি শয়তানদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে গেলাম কান্তা বারের অভ্যন্তরে। ঠিক পর পরই শয়তান দল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। ওরা ভদ্র যুবকটির অলক্ষ্যে কানে কানে কিছু বলে নিলো। আমি বুঝতে পারলাম সেই যুবকটিকে নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র চলছে।

থামলো দিপালী।

জ্যোতির্ময় যেন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বললো সে—তারপর কি হলো?

আমি মোসলে উদ্দিন ও তার দল বলের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে চুপি চুপি বললাম—পালিয়ে যান, পালিয়ে যান এখান থেকে কিন্তু তিনি আমার কথা কানে নিলেন না।

তারপর?

তিনি হাসলেন। আমি মনে করলাম যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতে হবে একটা ছোট চিরকুট এনে দিলাম তার হাতের মুঠায়। তিনি চিরকুট পড়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলেন। পারলাম না তাকে রক্ষা করতে।

দু চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো জ্যোতির্ময়—তাকে ওরা হত্যা করেছে?

না—তাকে ওরা হত্যা করেনি।

তবে কোথায়—কোথায় তিনি?

কান্তা বারের গভীর তল দেশে তাকে বন্দী করে রেখেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম কারা কক্ষ। যেখানে কেউ কোনদিন প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। শুধু কয়েকজন ছাড়া.....সত্যি লোকটার জন্য দুঃখ হয় আমার।

একটা অজানা অচেনা মানুষের জন্য তোমার দরদ দেখে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি। তোমার মনের মহৎ পরিচয় আমাকে খুশি করেছে। একটু থেমে বললো জ্যোতির্ময়—তোমার পুরস্কার এই হীরক অঙ্গুরী। নাও...

জ্যোতির্ময় নিজের আংগুল থেকে হীরক আংগুরী খুলে পরিয়ে দেয় দিপালীর হাতে। তারপর বলে—হাঁ, কি বলছিলোম দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় তুমি খুশি হতে পারোনি?

না।

কেনো?

আপনি জানেন না রাজকুমার দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় দেশের দুস্কৃতিকারী দল নব উদ্দমে তাদের কুকর্ম চালিয়ে চলছে। আপনি যাদের

কথা একটু পূর্বে বললেন, ধনকুরুের দল যারা আজ দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের অজুহাতে উৎসব দিবস পালন করে চলেছে তারা.....

দিপালী এদের তুমি দুস্কৃতিকারীর দলে ফেলেছো।

আপনি ঠিক্ জানেন না আসল দুস্কৃতিকারী কারা।

তুমি জানো—জানো দিপালী।

বিশ্বাস করুন আমি না জেনে কোন কথা বলিনা। কান্তা বারে যারা আসে তারা প্রথম স্তরের দুস্কৃতিকারী।

তুমি এদের কত জনার নাম জানো দিপালী?

অনেক?

তবুও?

দস্যু বনহুর হত্যা করেছিলো কয়েকজন চোরা চালানী ব্যবসায়ীকে কিন্তু এখনও তার বহু পার্টনার কান্দাই শহরের বুকে গোপনে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে যাদের সন্ধান জনসাধারণ তো জানেনই না এমন কি পুলিশ বাহিনীও নয়। এরা বিড়াল তপস্বীর মত সাধু সেজে দেশ ও দশের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে আংগুল ফুলে কলা গাছের মত ফেঁপে উঠছে। এদের মধ্যে মোসলে উদ্দিন সিরাজী ও তার সহকারী হুম ইয়া, জারু, মহিস উদ্দিন, ফারুক হোসেন।

এরা সবাই দুস্কৃতিকারী?

শুধু এরাই নয় এদের যারা সহায়তা করে তারাও দুস্কৃতিকারী, এক নম্বর হলো আমার বাবা হিম্মৎ খাঁ আরও আছে তারা শহরের গণ্যমান্য স্বনাম ধন্য ব্যক্তি নাইবা শুনলেন তাদের নাম।

কুমার জ্যোতির্ময় দু'চোখ বিস্ফারিত করে দিপালীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো। বললো সে—যাক স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম শুনে তাদের সম্মানের হানি করা মোটেই উচিৎ নয়। থাক তুমি একটা গান শোনাও দিপালী রাতটা সার্থক হোক।

দিপালী বলে উঠে—না আজ গান নয় আজ শুধু কথা। কুমার আপনি কি পারেন না এদের সায়েস্তা করতে?

একটু হেসে বললো কুমার জ্যোতির্ময়—যারা এদের সায়েস্তা করবে তারা তো পুলিশের লোক। দেখো দিপালী তুমি বলছো আমি শুনছি কিন্তু আমাদের কারো করবার কিছু নেই। তবে দুঃখ হয় দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ ভুখা, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আজ উন্মাদ প্রায়। দেহের মাংস কামড়ে খাবে ওরা এখন।

দিপালীর চোখ দুটো জ্বলে উঠে যেন, বলে সে—দেশের এ অবস্থার জন্য দায়ী কারা জানেন কুমার? ঐ সব নরপশুর দল যাদের নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়। এরা পরের মুখের খাবার লুটে নিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করে চলেছে। এদের কাছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন আফসোস নাই কারণ এরা দেশে ও দশের স্বনামধন্য ব্যক্তি। যে চাল দু'টাকা করে কিনবার সমর্থ নেই কারো অথচ এরা পাঁচ টাকা মূল্যেও কিনতে পারে কারণ এরা ধনকুবেরু। শুধু তাই নয় দেশের মুদ্রা বিদেশে পাচার করেও এরা টাকার পাহাড় বনে গেছে।

জ্যোতির্ময় দিপালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—কিন্তু এরা কারা?

ঐ সব স্বনাম ধন্য ব্যক্তি যাদের দেশবাসী শ্রদ্ধা করে সমীহ করে। যাদের আছে গাড়ি বাড়ি ঐশ্বর্য। যাদের ফিরে তাকবার সময় নেই দুঃস্থ অসহায় মানুষদের দিকে। মীর্জা মোহাম্মদ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার খাদ্য শস্য দেশের বাইরে পাচার করে.....

চুপ কে জেনো আসছে। বললো জ্যোতির্ময়।

দিপালী চুপ হয়ে গেলো।

জ্যোতির্ময় বললো—এবার তুমি যাও দিপালী রাত ভোর হয়ে আসছে।

হাঁ, আমি যাচ্ছি।

দিপালী বেরিয়ে যায়।

জ্যোতির্ময় ভাবতে থাকে দিপালীর কথাগুলো তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

❑

মিঃ হেলালীর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জন্মেছে। চোখ দু'টো কোঠরাগত। চোয়ালের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে এক ইঞ্চি করে। চুল গুলো রুক্ষ। হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে একটি লৌহ থামের সঙ্গে।

মিঃ হেলালীর সমস্ত দেহে চাবুকের আঘাতের গভীর কালো দাগ পড়ে গেছে। জামা কাপড় ছিড়ে গেছে চাবুকের আঘাতে।

দিনে দুটো শুকনো রুটি তাকে খেতে দেওয়া হয় আর ছোট এক গেলাস পানি। তবু পরিস্কার সচ্ছ পানি নয় অপরিস্কার পানি তাকে পান করতে দেয় ওরা।

শুধু মিঃ হেলালী নয় এমনি বহু অমূল্য জীবনকে এরা এমনি করে গোপন কারা কক্ষে তিল তিল করে শুকিয়ে মেরেছে। এরা সভ্য সমাজে নামি দামি গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত কিন্তু এরা দেশের ও সমাজের কলঙ্ক। এদের হাতে রয়েছে দেশের দুষ্কৃতিকারী গুন্ডাদল। সুযোগ বুঝে এরা লুট তরাজ এবং হাইজাক করে বেড়ায়। অবশ্য যারা জনগণের হাতে ধরা পড়ে তাদের আর বিচারের জন্য পৃথিবীর আদালতে নিতে হয়না বিচার হয়ে যায় জনগণের আদালতে। তবু এদের লজ্জা নেই, লজ্জাহীন নরপশুর দল এরা।

মিঃ হেলালীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন নর শয়তান এরা কয়েকদিন ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলো তাই আসতে পারেনি আজ এসেছে অবসর হয়ে। কারো হাতে হুইস্কির বোতল, কারো হাতে সরাব পাত্র কারো হাতে চাবুক।

মিঃ হেলালীকে ঘিরে চলেছে নানা রকম বিদ্রুপ তিরস্কার লাথি আর চাবুকের আঘাত। কেউ বা গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি পান করে বাকিটুকু ছুড়ে মারছে মিঃ হেলালীর মুখে।

মিঃ হেলালী নিরুপায়, সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন। সরাবগুলো তার চোখ মুখে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি।

মিঃ হেলালী ভাবতে পারেন নি এখানে এসে তার অবস্থা এমন দাঁড়াবে। তিনি চেয়েছিলেন দুষ্কৃতিকারীদের সন্ধান করে তাদের সায়েস্তা করা কিন্তু একটা বিরাট ষড়যন্ত্র তাকে অক্টোপাশের মত গ্রাস করে ফেলেছে। এখন থেকে কোনদিন তিনি পৃথিবীর আলোতে ফিরে যেতে পারবেন কিনা কে জানে।

❑

দিরুফার্ম থেকে কেউ যেন ফোন করলো। ফোন ধরলেন মিঃ ইলিয়াস। ওপাশ থেকে দিরু ফার্মের কোন এক কর্মচারী বলছেন —আমাদের দিরু ফার্মে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে এক্ষুণি আসুন:...

মিঃ ইলিয়াস তক্ষুণি জানিয়ে দিলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীকে।

মিঃ জায়েদী সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করে চা পান আশায় প্রস্তুত হয়ে বসেছেন ঠিক ঐ মুহূর্তে মিঃ ইলিয়াসের ফোন পেলেন। শিউরে না উঠলেও চমকে উঠলেন তিনি, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন— আবার খুন!

কোন রকমে চা পান শেষ করে বেরিয়ে পড়লেন দিরু ফার্মের উদ্দেশ্যে। মিঃ ইলিয়াস এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার প্রস্তুত ছিলেন তাদেরকে তুলে নিলেন পুলিশ অফিস থেকে।

দিরুফার্মে পৌঁছতেই দিরুফার্মের ম্যানেজার রশিদ উল্লাহ এসে এগিয়ে নিলেন। দিরুফার্মের প্রতিটি কর্মচারীর মুখমন্ডলে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। রশিদ উল্লাহ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে ভিতরে গেলেন। অনেকগুলো গুদাম কক্ষ পার হয়ে একটা বিরাট গুদাম কক্ষ। কক্ষের দরজায় তালা বন্ধ।

মিঃ জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার সহ রশিদ উল্লাহ এসে দাঁড়ালেন তারা বন্ধ গুদাম কক্ষটার সম্মুখে। রশিদ উল্লাহ কোমর থেকে বের করলো একটা চাবির থোকা। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলতেই দরজা আপনা আপনি খুলে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রধান ও তার সহকর্মীগণ শিউরে উঠলেন। দেখতে পেলেন প্রশস্ত একটি কক্ষ, কক্ষটি কোন এক গুদাম কক্ষ তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া এ কক্ষটি সম্পূর্ণ একটি গোপন কোন আড্ডাখানা। কক্ষের চার পাশে কাঠের বাক্স বিক্ষিপ্ত ছড়ানো রয়েছে। মাঝে কয়েকটা চেয়ার এবং একটি টেবিল। প্রত্যেকটা চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছে কিন্তু আশ্চর্য কারো দেহে মাথা নেই।

মস্তক বিহীন লাশ।

পুলিশ প্রধান এবং তার সহকারীগণ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা জীবনে বহু মৃত দেহ দেখেছেন কিন্তু এমন বিস্ময়কর মৃতদেহ দেখেন নাই।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন তাঁরা। সাহসী পুলিশ অফিসারগণের হৃদয়ও কেঁপে উঠলো। প্রতিটি চেয়ারের সঙ্গে প্রত্যেককে পিছমোড়া করে বেঁধে সেই অবস্থায় তাদের দেহ থেকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে।

হত্যালীলা যখনই ঘটুক তার রক্ত একেবারে শুকিয়ে যায়নি। প্রত্যেকটা চেয়ার গড়িয়ে চেয়ারের তলায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

মৃত দেহের জামা কাপড় রক্তে ভিজে পুনরায় শুকিয়ে উঠেছে। চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে স্থানে স্থানে। রক্তের কেমন যেন একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে জানালা বিহীন গুদাম কক্ষটার মধ্যে।

কক্ষ মধ্যে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছিলো কাজেই সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের যেন এতোক্ষণে হুস হলো। তাঁরা দেখলেন এক সঙ্গে সাতটি মৃত দেহ সাতখানা চেয়ারে বসা

রয়েছে। আশ্চর্য মস্তক বিহীন মৃতদেহগুলির একটির মস্তকও দুর্গম কক্ষের মেঝেতে পড়ে নেই।

পুলিশ অফিসার মহোদয়গণের চক্ষুস্থির। মৃতদেহ আছে অথচ মাথা নেই। মাথা গেলো কোথায়? আর কারাই বা এভাবে একসঙ্গে এতোগুলো হত্যালীলা সংঘটিত করেছে।

মিঃ জায়েদী স্বাভাবিকভাবে একবার কক্ষটার মধ্যে দেখে নিলেন তারপর দিরুফার্মের ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে বললেন—এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড সম্বন্ধে আমি আপনাকে এবং দিরুফার্মের কর্মচারীগণকে কিছু প্রশ্ন করবো।

শসব্যস্তে বললেন বৃদ্ধ রশিদ উল্লাহ—বলুন স্যার।

মিঃ জায়েদী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা রশিদ সাহেব, যারা মস্তকহীন অবস্থায় চেয়ারে বসা তারা কারা এবং এখানে কি কারণে এ ভাবে বসেছিলেন? নিশ্চয়ই সঠিক জবাব দেবেন?

বৃদ্ধ একসঙ্গে এতোগুলো হত্যাকান্ড জীবনে দেখেননি এবং এতো রক্তও তিনি দেখেননি কোনদিন। ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রথম থেকেই ঢোক গিলে তিনি জবাব দিলেন মিঃ জায়েদীর—স্যার, দিরু ফার্মের ম্যানেজার হলেও আমি দিরুফার্মের অনেককেই চিনিনা। কারণ দস্যু বনহুর দিরুফার্মের মালিক ও তাঁর সহকর্মীদের হত্যা করার পর আমাকে দিরুফার্মের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা হয়।

মিঃ ইলিয়াস বলে উঠলেন—পূর্বের ম্যানেজার কি হলেন?

সেই হত্যাকান্ডের পর ম্যানেজার ভয় পেয়ে চাকুরী ত্যাগ করে চলে যান।

পুনরায় মিঃ ইলিয়াসই প্রশ্ন করলেন—একজন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন আর আপনি সেই নৃশংস হত্যালীলার কথা জেনেও সেই দিরুফার্মের চাকুরীতে জয়েন করলেন আশ্চর্য বটে।

হাতের মধ্যে হাত কচলে বললেন রশিদ উল্লাহ—আমি প্রাণের মায়া করিনা এবং করিনা বলেই দিরুফার্মে ম্যানেজারের চাকরীটা নিয়েছি।

সংসারের প্রয়োজনে আমি দিরুফার্মে কাজ করলেও এখনও সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠিনি।

মিঃ জায়েদী গম্ভীর গলায় বললেন—তা হলে আপনি বলতে চান যারা এখানে মস্তকহীন অবস্থায় চেয়ারে বসে আছেন তাদের কাউকেই আপনি চেনেন না?

সত্যি বলতে কি আমি এদের কাউকেই চিনি না এমন কি এরা এখানে কেনো বসেছিলেন তাও জানি না।

তবে কে জানে?

দারওয়ান রেওয়াজ খান পুরোন মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সঠিক কথা বলতে পারবে।

দিরু ফার্মের শ্রমিক এবং কর্মচারীবৃন্দ সবাই এসে ভীড় জমিয়েছিলো। কিন্তু দারওয়ান রেওয়াজ খান কোথায়। অনেক ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকির পর রেওয়াজ খান এলো। সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিয়েছিলো আর ভোর রাতে খানিকটা নেশা পার করে ওর ছোট্ট ঘরটার মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো। ডাকা ডাকি শুনে দুলতে দুলতে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দৃষ্টি সম্মুখে ফেলতেই আর্তনাদ করে পাশেই দন্ডায়মান মিঃ জায়েদীকে জড়িয়ে ধরলো। সে ঐ মস্তকহীন রক্তাক্ত দেহগুলি দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

একটু সামলে নিয়ে চোখ মেললো দারওয়ান রেওয়াজ খান, ভয় বিহবল ভাবে তাকালো সে মস্তক বিহীন লাশগুলোর দিকে।

মিঃ জায়েদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—এরা কারা এবং কে এদের এ ভাবে হত্যা করেছে? বলো তুমি এ সম্বন্ধে কি জানো?

রেওয়াজ ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো—হুজুর কে এদের হত্যা করেছে আমি জানি না তবে এরা কারা আমি বলতে পারবো।

শুধু তই নয় এরা এখানে কি করছিলো তাও জানো তুমি নিশ্চয়ই?

হুজুর আমি জানি না।

মিঃ ইলিয়াস হুঙ্কার ছাড়লেন—নেকামী করো না যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে জবাব দাও।

মিঃ জায়েদী বললেন—এরা কে এবং কারা বলো?

রেওয়াজ খান এবার এগুলো, লাশগুলোর দিকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—এই ইনি হলেন দিরু ফার্মের পুরনো ম্যানেজার ইউসুফ নিয়াজী...

মিঃ জায়েদী তাকালেন নতুন ম্যানেজার রশিদ উল্লার দিকে, বললেন—আপনি একটু পূর্বে বললেন পুরোন ম্যানেজার সেই হত্যাকান্ডের পর চাকুরী ত্যাগ করে চলে গেছেন অথচ...আংগুল দিয়ে দেখালেন—রেওয়াজ খান বলছে এই মস্তক বিহীন দেহটা পুরোন ম্যানেজারের।

স্যার আমি ঠিক চিনতে পারিনি তাছাড়া তিনি এখানে কখন কোন পথে এসেছেন তাও আমি জানি না।

মিথ্যা কথা। আপনি নিশ্চয়ই গোপন করছেন আসল কথা।

স্যার বিশ্বাস করুন আমি এই গুদাম কক্ষে কোন সময় আসিনি।

জানিনা এখানে কি রাখা হয় এবং এরা এখানে বসে কি করেন।

মিঃ জায়েদী ফিরে তাকালেন রেওয়াজ খানের দিকে। বললেন— পরের চেয়ারে কে ইনি?

রেওয়াজ খানের নেশার ঘোর এতোক্ষণে সম্পূর্ণ কেটে গেছে, সে প্রত্যেকটা মস্তক বিহীন দেহ ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলো, বললো—হুজুর পরের চেয়ারে আমাদের মালিকের প্রধান বন্ধু মোসলে উদ্দিন সিরাজীর দেহ বলে মনে হচ্ছে। ঐ তো তার—ডান হাতের একটা আংগুল নেই।

আচ্ছা তার পরেরটা?

হুজুর এটা ঠিক চিনতে পারছি না তবে তার পরেরটার নাম ছিলো হুমাইয়া, বড্ড শয়তান লোক। হুজুর আমি বেটাকে মোটেই ভাল নজরে দেখতাম না।

যাক সে কথা বলো তার পরেরটা কে?

এরা সবাই মোসেলে উদ্দিনের লোক নামও জানি হুজুর।

জানো তবে বলো?

হুজুর এটা মহিস উদ্দিন, এটা জারু, এটা ফারুক হোসেন। এরা সবাই বদ লোক হুজুর।

এরা বদ লোক কি করে জানলে তুমি।

হুজুর সব সময় খালি রিজভী সাহেবের কাছে আসা যাওয়া করছে আমি জানবো না।

তবে তুমি আরও খোঁজ খবর জানো?

তা কিছু কিছু জানি বই কি।

বলো এরা এখানে বসে কি করছিলো, মাঝখানে টেবিল আছে অথচ টেবিলে কিছু দেখছি না।

ঐ কথা আমিও বলতে পারবোনা তবে ঠিক প্রতি রোববারে ফার্ম বন্ধ থাকাকালে এই গুদাম ঘরে এরা গোপনে বসতো এই জানি। হুজুর দারওয়ান বলে কেউ আমাকে গোপন কথা বলতো না তা ছাড়া আমাকে ওরা বলবেই বা কেনো। পেটের দায়ে দিরু ফার্মে কাজ করি সব দেখেও না দেখার ভান করি সব বুঝেও না বোঝার...

বুঝেছি তুমি অত্যন্ত চালাক লোক। বললেন মিঃ ইলিয়াস!

হাসলো দারওয়ান—হুজুর আজকাল চালাক হলেও বোকা বনে থাকতে হয়। জেনেও না জানার ভান করি বলেই আজও ছিলাম বা আছি। এই যে এ ধারে যে মাথা কাটা লাশটা দেখছেন এটা কান্দাই শহরের বড় নামি ধামি লোক হুজুর। যদিও এনাকে প্রকাশ্যে এখানে আসতে দেখিনি তবু চিনতে আমার ভুল হবে না কারণ একে গোপনে আসতে দেখেছি অনেকবার। হুজুর নাম বলবো না।

তবে তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হবে। বললেন মিঃ জায়েদী।

বললো রেওয়াজ খান—বললে আমার তো কোন দোষ হবে না?

না বরং সত্য সত্য কথা বললে তুমি বেঁচে যাবে। বললেন ইলিয়াস সাহেব।

রেওয়াজ খান বললেন—হুজুর ইনি সরকারের লোক মানে আপনাদের দলের লোক।

বলো অমন হেয়ালী করোনা রেওয়াজ খান। বললেন নতুন ম্যানেজার রশিদ উল্যাহ।

পুলিশ অফিসারগণ তখন তীক্ষ্ণ নজরে লাশটাকে চিনবার চেষ্টা করছেন কিন্তু কেউ চিনতে পারছেন না।

রেওয়াজ খানই বললো—কান্দাই এর নামিধামি মানুষ মির্জ্জা মোহাম্মদ!

রেওয়াজ খান বললো—হাঁ ইনিই তো কান্দাই শহরের মানুষের মুখের খাবার গোপনে সংগ্রহ করে বাহিরে পাচার করেন। হুজুর এখানে তারই কোন গোপন বৈঠক হচ্ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং তার সঙ্গীদের মুখমন্ডল মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হলো। সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলেন। শুধু বিস্ময়কর হত্যাকান্ড নয় একেবারে আশ্চর্যকর ঘটনা—মীর্জ্জা মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন।

রেওয়াজ খান এর বেশি কিছু বলতে সক্ষম হলো না। তবু আরও কিছুক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন মিঃ জায়েদী। রেওয়াজ খান ছাড়াও যারা দিরুফার্মে কাজ করে তাদের প্রায় সবাইকে নানা রকম প্রশ্ন করলেন কিন্তু কোন হদিস খুঁজে পেলেন না তারা।

মিঃ জায়েদী বললেন—পূর্বে হলে মনে করা হতো এ দস্যু বনহুরের কীর্তি কিন্তু এ হত্যাকান্ড সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এবং রহস্যপূর্ণ। কে বা কারা এ হত্যালীলা সংঘটিত করেছে কে জানে।

এই মস্তক বিহীন লাশগুলোর কথা সমস্ত শহরে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার লোক ভীড় জমালো দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে।

নানাজনের নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। যাদের মস্তক বিহিন লাশ পাওয়া গেলো—তারা সত্যি রেওয়াজ খানের সনাক্তা ব্যক্তি কিনা এ কারণে লাশগুলি যেভাবে ছিলো সেই ভাবেই রাখা হলো।

দিরু ফার্মের পুরোন কর্মচারীগণকে ডেকে নানা রকম কৈফিয়ৎ তলব করতে লাগলেন মিঃ জায়েদী এবং মিঃ ইলিয়াস। কিন্তু কোন হদিস পেলেন না এই হত্যাকান্ডের।

মিঃ জাফরীও সংবাদ শুনে গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন, তিনি নিজেও এ হত্যাকান্ড দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তার সন্দেহ হলো—এটা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঙ্গেরী কারাগারে ফোন করলেন। সেখানে ফোন করে জানতে পারলেন দস্যু বনহুর ঠিকই আটক আছে। কাজেই এটা দস্যু বনহুরের দ্বারা সংঘটিত হয়নি বুঝতে পারলেন তারা।

এতোগুলি মস্তক বিহিন দেহের মস্তকগুলো গেল কোথায়। সমস্ত দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও কোন স্থানে একটি মস্তকও পাওয়া গেলো না। এতোগুলি মস্তক যেন হাওয়ায় উধাও হয়েছে।

লাশগুলো নিয়ে শহরে দারুন চাঞ্চল্য দেখা দিলো। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেলো এই হত্যালীলা আচম্বিতে সংঘটিত হয়নি। হত্যার পূর্বেই এদের হৃৎপিন্ড মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিলো। দারুন নির্যাতন দ্বারা এদের হত্যা করা হয়েছে।

এই মৃত্যু সংঘটিত হবার ঠিক দু'দিন পর একই ভাবে একটি চলন্ত ট্রেনের কামরায় তিনটি মস্তক বিহিন মৃতদেহ পাওয়া গেলো।

এই ট্রেনটি বিশেষ কোন ট্রেন ছিলো, যে ট্রেনে সাধারণ যাত্রীর আরোহণ নিষিদ্ধ ছিলো। কান্দাই এর বিশিষ্ট নাগরিকগণই এই ট্রেনের যাত্রী হতে পারতেন।

বিশেষ ট্রেনটির বিশেষ একটি কামরায় এই মস্তক বিহীন তিনটি লাশ ছিলো। ট্রেনটি যখন কান্দাই ত্যাগ করে কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো তখন হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে।

কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করার পরেই ছোট্ট ষ্টেশন জংতু। ঐ জংতু ষ্টেশনেই দেখা গেছে মস্তক বিহীন লাশ গুলো। এই মৃতদেহ পুলিশ দেখার পর পুনরায় ট্রেন খানা কান্দাই ফিরে আসে।

পুলিশ মৃতদেহ সনাক্ত করার পর মাথায় বজ্রাঘাত হলো কান্দাই বাসীর যারা নিহত হয়েছেন তারা কান্দাই এর বিশিষ্ট নাগরিক। এরা তিন জনই

সরকারের সম্মানিত পদের অধিকারী দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান এবং হাসান কাদেরী।

পুলিশ অনেক তদন্ত করেও এই হত্যা রহস্যের কোন "ক্লু" আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। পর পর এই আশ্চর্যজনক হত্যাকান্ড জনগণকে একেবারে ভীত করে তুললো।

জনগণ ভেবে পাচ্ছেনা দেশের এই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এভাবে নিপাত হচ্ছে কেনো। সবার মনেই প্রশ্ন কিন্তু কেউ এর সমাধান খুজে পাচ্ছেন না।

দেশের জনগণ জানেন এরা দেশ ও দশের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কিন্তু আসলেই কি তাই?

সেদিন দিরুফার্মে বীভৎস হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করার মতলবে ছিলেন এবং সে কারণেই দেশ ত্যাগ করে আত্মগোপন আশায় দেশের বাইরে যাচ্ছিলেন দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান, এবং হাসান কাদেরী কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যেমন চিরকাল ব্যর্থহ য়ে এসেছে অসৎ প্রচেষ্টা। অন্যায় কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা পারবেও না। নিয়তীর হাতছানিতে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

পুলিশ মহল এই হত্যাকান্ডের তদন্ত ব্যাপার নিয়ে হীমসীম খেয়ে পড়লেন। তারপর মিঃ হেলালীর অন্তর্ধান পুলিশ মহলে এক ভীষণ দুর্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলো। অনেকেরই ধারণা এ হত্যালীলা দস্যু বনহুরের অনুচরদের কাজ এবং মিঃ হেলালীকে নিখোঁজ করেছে তাও এদেরই ষড়যন্ত্রে।

মিঃ হেলালীকে নিয়ে পুলিশ মহল নানাভাবে শহরে তল্লাশী চালিয়ে চলেছেন কিন্তু কোথাও তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

পুলিশ মহল অবশ্য জানেন যে মিঃ হেলালী কান্তা বারে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি উধাও হয়েছেন। এজন্য কান্তা বারে তল্লাশী চালিয়ে ছিলেন রীতিমত ভাবে কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

❑

প্রতিবারের মত এবার দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে হাত পা খোলা অবস্থায় রাখা হয়নি তাকে কারাগার কক্ষে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে! শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দস্যু বনহুরকে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করতে হয়। সাধ্য নাই সে এই লৌহ কারা কক্ষ থেকে লৌহ শৃঙ্খল মুক্ত করে পালাতে সক্ষম হবে।

কাজেই দস্যু বনহুর সম্বন্ধে পুলিশ মহল নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর হত্যালীলা কে বা কারা সংঘটিত করে চলেছে পুলিশ মহল কিংবা গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে এতোটুকুও ক্লু আবিষ্কার করতে পারছেন না।

কান্দাই প্রেসিডেন্ট আবু গাওসের কড়া হুকুম দিয়েছেন এরপর যদি এই ধরণের হত্যালীলা কান্দাই শহরের বুকে সংঘটিত হয় তাহলে পুলিশ মহলকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

এ কারণে পুলিশ মহলের তোড় জোড় পূর্বের চেয়ে আরও শত গুণ বেড়ে গেছে। গোয়েন্দা বিভাগের মুহূর্ত বিশ্রাম হচ্ছে না, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সবাই এই হত্যারহস্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন।

একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তবু কিন্তু হচ্ছেনা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রহমান পেরেশান হয়ে পরিশ্রম করে চলেছেন পুলিশ প্রধানগণ। এক মুহূর্ত যেন কারো অবসর নেই নিশ্বাস ফেলার। বিনা কারণে অনেককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং তাদের মারপিট করে নানা রকম কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে।

সাধারণ নাগরিক জীবন ক্রমান্বয়ে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। একদিকে পুলিশ মহলের তৎপরতা অপর দিকে প্রতি মুহূর্তে জীবন নাশের ভয়। এ যেন এক মহা সঙ্কটময় অবস্থা।

এমনি দিনেও কান্তা বারে জনগণের ভীড় কমেনি। তবে হিম্মৎ খাঁ দমে গেছে একেবারে কারণ তার বিশিষ্ট কয়েকজন পার্টনার এবং সহকারীর অদ্ভুত মৃত্যু তাকে শুধু ভীতই করেনি ভিতরে ভিতরে সে দমে গেছে একেবারে।

আজকাল সে অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করে থাকে, না জানি কখন তার ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে। তার পুরোন বন্ধুদের মধ্যে যারা আছে তারা তাকে নানা ভাবে সাহস যুগিয়ে আসছে।

সেদিন কান্তা বারের অভ্যন্তরে একটি গোপন কক্ষে কয়েকজন বসে গোপন আলোচনা করছিলো। হিম্মৎ খাঁর কয়েকজন সহকারী ছাড়াও সেখানে ছিলো শহরের কয়েকজন নামি মানুষ, যারা এক এক জন উচ্চ পদের অধিকারী।

হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে তাদের গোপন ব্যবসা নিয়ে আলাপ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব।

ব্যবসাটা সাধারণ ব্যবসা নয় বিদেশ থেকে যে সব সাহায্য দ্রব্য কান্দাই দুঃস্থ জনগণের জন্য পাঠানো হয় এ গুলোর মোটা অংশ কান্দাই পৌছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে বিক্রয় হয়ে যায়। সাহায্য দ্রব্য বিক্রয় করে এই সব স্বনাম ধন্য ব্যক্তিগণ কোটি কোটি টাকার মালিক বনে বসে আছেন। কান্দাই শহরে একটি বা দুটি নয় গুটি কয়েক বাড়ি গাড়ি এবং ইন্ডাষ্ট্রি ও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

অসহায় মানুষের মুখের আহার চুরি করে যে ইমারৎ গড়ে তুলছে দেশে তাঁদের সেই ইমারৎ ভোগ দখলে আসে কিনা এ সব নিয়েই আলোচনা চলছিলো।

হিম্মৎ খাঁ বললো—বেটা দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে ভেবেছিলাম এবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাবো কিন্তু কে যে এমন শয়তানী শুরু করলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।

মোসিয়ে খান ইনি একজন দেশে প্রেমিক এবং সমাজ সেবক গরীবের পরম বন্ধু নামে খ্যাত তিনি মুখে সদা সর্বদা তোওবা তোওবা বলেন। পরের

জিনিসে তার মোটেই লোভ নেই তবে কিছু টাকা পয়সা তাঁর ভাগ্যে এসেছে যেমন ছাপ্পরে ফেঁড়ে আসে তেমনি করে।

সেবার কান্দাই দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। সমস্ত দেশ ব্যাপি হাহাকার। নানা রকম রোগে শোকে মানুষ মরতে লাগলো। কারণ তারা ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য ভক্ষণ করে নানা রকম অসুখে পড়লো। এ সংবাদ বাইরের দেশ জানতে পেরে নানা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধপত্র সাহায্য পাঠাতে শুরু করলো। তখন মোসিয়ে খান হলেন এই সাহায্য কমিটির প্রধান কাজেই পয়সা আপনা আপনি পায়ে হেটে তাঁর কোঁচড়ে আসতে লাগলো। তিনি দু'হাতে এ সব পয়সা লুটে নিতে লাগলেন। কাজেই পয়সা তার ভাগ্যে ছাপ্‌ড় ফেঁড়েই এসেছে। সেই পয়সায় সামান্য কয়েকখানা বাড়ি গাড়ি করতে পেরেছেন এই যা।

যা হোক এতোদিন বেশ আরামেই কাটছিলো হঠাৎ দেশের আবহাওয়া যেন পালটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। দেশের জনগণ কোনদিন হিসাব নিকাশ নিতে আসেনি, তিনি এতো টাকা পয়সা বা ঐশ্বর্য কোথায় পেলেন কেউ কোনদিন কৈফিয়ৎ তলব করেনি। এতোদিনে মনের মধ্যে এমন একটা দুশ্চিন্তা আসেনি যে তার ভাগ্যাকাশে কোনদিন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে।

উপস্থিত তার কয়েকটি খাদ্য গুদামে বহু খাদ্য মজুত আছে। প্রায় লক্ষ লক্ষ মন চাল গম তিনি জমা রেখেছেন সুযোগ বুঝে ছাড়বেন যাতে দশ গুণ মুনাফা আসে।

যত ভাবনা মোসিয়ে খানের এই গুদামজাত মালের জন্য। তাই গোপনে বৈঠক ডেকেছেন এ মাল কি ভাবে দেশ থেকে বিদেশে পাচার করা যায়। তা ছাড়া ইদানিং যে ভাবে হত্যালীলা শুরু হয়েছে তাতে কখন যে তাঁর জীবনাকাশে কুয়াশা নেমে আসবে কে জানে। তাছাড়া উপস্থিত কিছু সাহায্য দ্রব্যের মোটা মাল হিম্মৎ খাঁর নিকটে বিক্রয় হয়ে গেছে তারও হিসাব নিকাশ হবে আজ।

হিম্মৎ খাঁর কথায় বললেন মোসিয়ে খান—আমার মনে হয় যারা এমন ভাবে বেছে বেছে হত্যা করছে তারা শুধু মানুষ নয় দুস্কৃতিকারী।

হিম্মৎ খাঁ হেসে বললো—দুস্কৃতিকারী আর শয়তান তফাৎ কি ঐ একই কথা।

কিন্তু আশ্চর্য আমরা কত গোপনতা সহকারে কাজ করি তা ঐ দুস্কতিকারীরা জানলো কি করে? দেখছো না কেমন নিখুঁতভাবে হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে।

হিম্মৎ খাঁ তার গোঁফে তা দিয়ে বললো—যতই যা করুক কারো সাধ্য নেই কান্তা বারে প্রবেশ করে। দেখুন মোসিয়ে খান আমাদের ব্যবসা কেউ বন্ধ করতে পারবেনা।

কিন্তু গুদামের মাল কোন পথে চালান করবো হিম্মৎ খাঁ বলে দাও? আমার মাথাটা যেন কেমন করছে। হঠাৎ যদি কোনক্রমে দুস্কৃতিকারীরা জানতে পারে।

আপনি নির্ভয়ে থাকুন সাহেব কোন চিন্তা করতে হবে না আপনাকে গুদামে মাল আছে চিন্তা আমার আছে আপনি শুধু টাকার মালিক। মাল নিয়ে টাকা দিয়ে দিবো। আগামীকাল রাত তিনটায় আমাদের ট্রাকগুলো যাবে। খেয়াল রাখবেন কেমন।

আচ্ছা ঠিক খেয়াল থাকবে। কিন্তু...

কোন কিন্তু নাই সাহেব মাল বোঝাই ট্রাকগুলো রাতের অন্ধকারে কান্দাই ত্যাগ করে চলে যাবে কেউ টেরও পাবেনা। প্রত্যেকটা গাড়ির গায়ে রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা আছে কাজেই কেউ দেখে ফেললেও ভয়ের কোন কারণ নাই.....কে কে ওখানে? বললো হিম্মৎ খাঁ।

এগিয়ে এলো দিপালী—বাবা আমাকে তুমি ডেকেছো?

না। এতো রাতে জেগে আছিস?

বাবা তুমি শোবে কখন?

তাই দেখতে এসেছিস বেটি?

হাঁ বাবা।

যা তুই চলে যা আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা। দিপালী এগিয়ে যায় তার নিজের কক্ষের দিকে।

পা বাড়াতেই অন্ধকারে কেউ যেন তার সম্মুখে দাঁড়ালো।

দিপালী চমকে চিৎকার করতে যাচ্ছিলো কিন্তু চিৎকার করবার পূর্বেই তার মুখে হাত চাপা দেয় রাজকুমার জ্যোতির্ময়।

দিপালী চাপা কণ্ঠে বলে—কে?

জ্যোতির্ময় বলে উঠে—আমি।

রাজ কুমার।

হাঁ।

আপনি এতো রাতে?

কেনো আসতে মানা ছিলো নাকি?

না।

তবে?

রাজকুমার এখানে এভাবে আসাটা আপনার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

জানি।

তবু যখন তখন কেনো আসেন বলুন তো?

বলেছি তোমাকে ভাল লাগে তাই।

চলুন, ঘরে চলুন।

রাজকুমার জ্যোতির্ময় আর দিপালী এগিয়ে চলে দিপালীর কক্ষের দিকে।

তখনও কান্তা বার থেকে ভেসে আসছিলো—পুরুষ কণ্ঠের জড়িত হাসি আর গানের শব্দ। মাঝে মাঝে বোতলের টুন টান শব্দও শোনা যাচ্ছে।

জ্যোতির্ময় বললো—কান্তা বারের বন্ধু বান্ধব ছেড়ে নির্জনে কেন দিপালী?

আজ সন্ধ্যা থেকে মন ভাল নেই কিনা তাই। কুমার আপনি আর আসবেন না।

কেনো?

ভয় হয় আপনি কোন বিপদে পড়েন।

একটু হেসে বলে জ্যোতির্ময়—বিপদ! কিসের বিপদ?

আপনি জানেন—আমাদের কান্তা বারের কয়েকজন পুরোন লোক মারা পড়েছে—যেমন মোসলে উদ্দিন ও তার সহচরগণ। মীর্জা মোহাম্মদ আরও অনেকে.....কি নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

আমি নিজ চোখে না দেখলেও অনুমানে বুঝতে পারছি কি ভয়ঙ্কর এই হত্যাকান্ড যা কল্পনা করা যায় না। না জানি কে সে নরঘাতক যার প্রাণে এতেটুকু মায়ার ছোঁয়াচ নেই। শুনেছি আরও তিনজন এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

হাঁ কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ পথে যখন কান্দাই মাল যাচ্ছিলো ঐ সময় কে বা কারা ট্রেনের মধ্যে তিন জনকে হত্যা করেছে।

আহা কত অসহায় অবস্থায় এদের হত্যা করা হয়েছে। এরা সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি ছিলো বলে মনে হয়।

রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের কথা শুনে বলে উঠে দিপালী—আপনি সরল সহজ মানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। এ কদিনে যারা এই নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তারা একটিও সৎ বা মহৎ ব্যক্তি নন। এরা জনসমাজে নামি দামি ব্যক্তি হলেও ভিতরে ভিতরে এরা দুস্কৃতিকারীদের মূল স্তম্ভ। এরাই সমাজের এবং জাতীর কলঙ্ক...

দিপালী তুমি জানো আর জানোনা বলেই এদের দোষারুপ করছো। মীর্জা মোহাম্মদ ছিলেন একজন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

কুমার জ্যোতির্ময় এবং দিপালীর যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে হিম্মৎ খাঁ। কারণ যখন মোসিয়ে খানের সঙ্গে তার গোপন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন দিপালী কি কারণে সেখানে গিয়েছিলো এ ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছিলো তার মনে। তাই মোসিয়ে খানের ইংগিতে হিম্মৎ খাঁ এসেছিলো কন্যা দিপালীর কক্ষের দরজায়।

কানে এলো জ্যোতির্ময়ের কণ্ঠস্বর—তোমার বাবা একজন মহৎ সৎজন ব্যক্তি। কোন সময় তিনি মন্দ কাজ করতে পারেন না তেমনি পারেন না যারা আসেন তোমাদের এই কান্তা বারে।

এর বেশি শোনার সখ আর হলো না হিম্মৎ খাঁর। জ্যোতির্ময় এসেছে দিপালীর কক্ষে এ তাদের পরম সৌভাগ্য। এই রাজকুমার যেদিন থেকে কান্তা বারে পা দিয়েছে সেদিন থেকে কান্তা বারের অদৃষ্ট খুলে গেছে। পূর্বে যা আয় ছিলো তার চতুরগুণ আয় হচ্ছে এখন। জ্যোতির্ময় প্রতি রাতে দিপালীকে যে স্বর্ণমুদ্রা দান করে তা কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকার চেয়েও বেশি। হিম্মৎ খাঁ এ-কারণে জ্যোতির্ময় এর আসা যাওয়ায় কোন আপত্তি করতো না কোন সময় বরং খুশি ছিলো সে মনে মনে!

হিম্মৎ খাঁ জ্যোতির্ময়ের মুখে নিজের ও তার সহকারীগণের প্রসংশা শুনে খুশি হয়ে চলে যায়।

দিপালী বলে—কুমার আপনি জানেন না এরা কতখানি অসৎ ব্যক্তি। আমি এদের সবাইকে হাড়েহাড়ে চিনি। যারা ট্রেনের নিভৃত কামরায় নিহত হয়েছেন তারা তিন জনই বদলোক ছিলেন।

তাই নাকি?

হাঁ। যেমন আজ যিনি বাবার সঙ্গে গল্প করছেন জানেন তিনি কে?

তা আমি কেমন করে জানবো কে না কে তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করছেন?

উনি একজন নামি লোক। সবাই তাকে যথেষ্ট সম্মান করেন কারণ তিনি একজন মহৎ, পরোপকারী সমাজ সেবক বা দুঃস্থ জনগণের হিতাকাঙ্খী বন্ধু।

সত্যি। এমন এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুশি হতাম এবং নিজকে ধন্য মনে করতাম।

কিন্তু.....কথাটা শেষ না করেই দিপালী খিল খিল করে হেসে উঠলো।

জ্যোতির্ময় বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো দিপালীর মুখের দিকে। বললো—হাসছো যে বড়?

রাজকুমার সত্যি আপনি একজন অজ্ঞ ব্যক্তি।

কারণ?

কারণ আপনি আমার কথার কিছু বুঝতে পারেন নি।

দিপালী তুমি কি সব সময় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। সত্যি কি আমি অজ্ঞ, কিছু বুঝি না?

যদি এতো বোঝেন তাবে কেনো না বোঝার ভান করেন বলেন তো? মোসিয়ে খান একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। কান্দাই শহরে তার বেশ কয়েকটা রাজপ্রাসাদ সম ইমারত আছে। আছে কিছু সংখ্যক গাড়ি ও ইন্ড্রাষ্ট্রিজ। এখনও তার গুদামে কয়েক লক্ষ মণ চাল গম মজুত আছে.....

জ্যোতির্ময় তাকিয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে দিপালীর মুখের দিকে, বলে—তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে দিপালী?

কি যে বলেন আমার হিংসে হবে? সত্যি বলতে কি আমার কি মনে হয় জানেন—ওনাকে ঐ গুদামের বস্তার নিচে গুদামজাত করে রাখি। হয়তো তা হলে ওনার কিছুটা আশা পূর্ণ হবে।

কে বললো তুমি এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে হিংসে করছো না। বেচারী কত কষ্ট করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মত কিছুটা জায়গা আর টাকা পয়সা করেছেন তা তোমার সহ্য হচ্ছেনা।

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন হিংসে নয় দুঃখ ব্যথা।

দুঃখ! ব্যথা! কিসের দুঃখ আর কিইবা ব্যথা?

এবার দিপালীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। বললো সে—কান্দাই বাসীদের জন্য বিদেশ থেকে যে সাহায্য দ্রব্য আসে তার তিন ভাগ আত্মসাৎ করেন এই মহান ব্যক্তি...শুধু ইনি নন এর মত আরও দশজন। তারপর বাকি এক ভাগ দেন দুঃস্থ জনগণের কল্যাণার্থে কিন্তু সেগুলোও তার নিম্নস্তরের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে কিছু সামান্য অংশ

আসে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে। তখন ঐ যৎ সামান্য সাহায্যদ্রব্য বণ্টন করতে গিয়ে দেখা যায় মারা-মারি, কাড়া-কাড়ি এমন কি খুনা খুনি.....কুমার আপনি স্বচক্ষে যদি দেখতেন সেই সব অসহায় মানুষের করুণ মর্মস্পর্শী চেহারা তা হলে অমন করে বলতে পারতেন না। দিনের পর দিন অনাহারে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে। পেটে অন্ন নেই পরনে বস্ত্র নেই অসুখে ঔষধ নেই অথচ তাদেরই মুখের আহার কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ আজ স্বনাম ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

দিপালী তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি দুঃস্থ জনগণের পরম বন্ধু। কিন্তু শুধু মুখে দুঃখ প্রকাশ করে কি লাভ হলো? পারবো তুমি বা আমি এদের কোন উপকার করতে?

হতাশ ভরা কণ্ঠে বলে দিপালী—সেই কারণেই তো এতে দুঃখ এতো ব্যথা আমার। আর সেই কারণেই আমি বারণ করি আপনি এখানে আসবেন না। এখানে কোন ভাল মানুষ আসেনা।

দিপালী কি যে বলছিলে, এখনও তার গুদামে কয়েক লক্ষ মন চাল-গম মজুত আছে...

হাঁ মোসিয়ে খান বাবাকে বলছিলেন তার গুদামে এখন বহু মাল আছে আগামীকাল রাত তিনটায় গাড়ি যাবে সেই গাড়ি ভর্তি মাল উঠবে তারপর রাতের অন্ধকারে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাবে কান্দাই থেকে। গাড়িতে রেডক্রসের চিহ্ন থাকবে তাহলেই জনগণ বুঝতেও পারবেনা কিছু...

জ্যোতির্ময় দু'চোখ কপালে তুলে বললেন—আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক মোসিয়ে খান। রেডক্রসের মার্কা থাকলে কেউ কোন সন্দেহ করবেনা মনে করবে বিদেশ থেকে মাল আসছে তাই না?

হাঁ এই রকমই বুদ্ধি এটেছেন ঐ মহান ব্যক্তিটি আমার বাবাও তারই দলের একজন।

যাক ও সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বলো? এসেছি যখন একটি গান শোনাবেনা দিপালী?

এতো রাতে গান শোনার সখ হয়েছে রাজকুমার?

হাঁ তাই তো ছুটে এসেছি কান্তা বারে। দিপালী এখন রাত কত?

রাত অনেক হয়েছে রাজকুমার। আপনার যাবার সময় হয়েছে।

যদি না যাই?

না এখানে থাকা ঠিক হবে না আপনার। আপনি চলে যান। এ বিষাক্ত পুরিতে আপনাকে আমি থাকতে দেবোনা। রাজকুমার দিন দিন আমি এই কান্তা বারে হাঁপিয়ে উঠছি।

কেনো?

আপনি কি জানেননা এখানে কত কষ্টে আছি। প্রতিদিন আমাকে কত জনের মন তুষ্টি করতে হয়। আমি আর পারছিনা এই দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে।

হাঁ সেই কারণেই তো আমি তোমাকে চাই দিপালী। তুমি শুধু আমার হবে। শুধু আমার হবে দিপালী...

জ্যোতির্ময় দিপালীকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে কানে ভেসে আসে একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ।

জ্যোতির্ময় চমকে উঠে—দিপালী এ কিসের শব্দ।

দিপালী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—আজ আবার কোন হত ভাগ্যকে কান্তা বারের অন্ধকার কক্ষে বন্দী করা হলো।

জ্যোতির্ময়ের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

দিপালী বলে—রাজকুমার এই কান্তা বারের অভ্যন্তরে কত যেন নৃশংস কাজ প্রতিদিন সমাধা হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবোনা। কত মহৎ মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে গোপনে ধরে এনে এখানে তাদের আটক করে রাখা হচ্ছে এবং তাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন।

আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে জ্যোতির্ময়—এ সব করে কি লাভ তোমাদের।

সৎ মহৎ ব্যক্তিদের দেশ থেকে সরিয়ে ফেলাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজকুমার যেমন আপনাকে আমরা হাতের মুঠায় নিয়ে পুতুল নাচ নাচাচ্ছি।

দিপালী!

সত্যি রাজকুমার আপনি একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন আমার কথা সত্যি কিনা। বিদেশী একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার গোপন সে ষড়যন্ত্র।

দিপালী আমি ঠিক তোমার কথাগুলো বুঝতে পারছি না। একটু খোলাসা বলবে কি?

রাজকুমার আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নাই তবে...

থাক তবে বলো না।

না না বলবো কিন্তু যদি আমাদের দলের কেউ জানতে পারে তা হলে।

বিপদ তোমার অনিবার্য এই তো? কিন্তু মনে রেখো দিপালী আমি তোমাকে উদ্ধার করবোই করবো—এই কান্তা বারে আর তোমাকে পঁচে মরতে দেবোনা।

সত্যি।

হাঁ সত্যি। এবার বলো কি সে কথা যা বলতে তোমার এতো বাঁধছে?

ও তেমন কিছু না।

তবু বলো দিপালী?

জ্যোতির্ময় ওকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে মুখ খানা তুলে ধরে।

দিপালী ওর ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকায় রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের মুখে, বলে সে ধীরে ধীরে—বিদেশী কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। তারা কান্দাই বাসীর সর্বনাশ করে নিজেরা বাঁচতে চায়। কান্দাই বাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বাঁচতে চায় তারা। এরই একটি বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে...যা আপনি বুঝতে পারবেন না।

দিপালী ঠিক বুঝতে পারছিনা আরও একটু খুলে বলো না?

বলছি শুনুন কিন্তু বাহিরটা একবার দেখে আসুন। রাজকুমার যদি কেউ আমাদের লোক ওৎ পেতে আমাদের সব কথা শোনে।

• বেশ আমি যাচ্ছি এক্ষুণি দেখে আসছি। কেউ বাইরে আছে কিনা। জ্যোতির্ময় বেরিয়ে যায় একটু পরে ফিরে আসে—না কেউ নেই বাইরে।

দিপালী বলে—দেখুন রাজকুমার ষড়যন্ত্র যদি না হতো তবে কেন দেশের লোক হয়ে দেশের মানুষের সর্বনাশ করবে। কেন নিজেদের মুখের আহার চুরি করে বাইরে চালান করবে। কেনো সৎ মহৎ ব্যক্তিদের মাথায় বদনামের বোঝা চাপিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হবে। কেন—কিসের জন্য দেশের মানুষ হয়ে দেশের মানুষের টুটি ছিড়ে ফেলছে? শুষে নিচ্ছে একজন আর এক জনের বুকের রক্ত। সব ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত।

দিপালী।

হ্যাঁ আমি সব জানি।

জানো সব জানো তুমি?

জানি অনেক বন্ধু জুটেছে আমাদের তারা বিড়াল তপস্বী সেজে আমাদের তাজা রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। যেমন আমি জানি আমার বাবা এ দেশীয় নয় কিন্তু সে এখন এই কান্দাই শহরের একজন নামী লোক। কান্দাই উচ্চ স্তরের লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশা এমন কি এক আত্মা বলা চলে। এমনি বহু লোক ধরে আছে যারা কান্দাই বাসী নয় অথচ কান্দাই শহরে তারা বহুকাল ধরে বসবাস করছে এবং কান্দাই এর একজন হিতাকাঙ্খী সেজে বসেছে এরাই গোপনে দেশের মহান ব্যক্তিদের হাত করে তাদেরই মা ভাই বোনের মুখের আহার গোপনে সংগ্রহ করে চালান দিচ্ছে নিজের দেশে। উদ্দেশ্য কান্দাই বাসীকে অন্তঃসারশুন্য করে নিজের দেশের জনগণের উদর পূর্ণ করা।

দিপালী তুমি এতো জানো। সত্যিই তুমি বুদ্ধিমতি নারী।

রাজকুমার জানি না বুঝি না তবু অনুমান করি! সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন মোসলে উদ্দিন তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কান্দাই এর একজন বাসিন্দা—কেনো তিনি গোপনে কান্দাই এর খাদ্য শস্য হরণ করে বাইরে পাঠাতেন। শুধু মোসলে উদ্দিন নন ধরুন মীর্জা মোহাম্মদ তিনিও তো একজন কান্দাই এর নাগরিক কিন্তু কেনো তিনি বিদেশী চক্রান্তে আত্মহারা হয়ে দেশের সর্বনাশ করতেন। এমনি শত শত জ্ঞানী বুদ্ধিমান স্বনামধন্য ব্যক্তি সার্থান্ধ হয়ে নিজের পায়ে আজ কুঠার

মারছেন। দেশের সামগ্রী গোপনে পরের হাতে তুলে দিয়ে নিজের মা-বোন সন্তানদের মুখে কষাঘাত করছেন। কেনো আজ যারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে তারা কি মোসলে উদ্দিনের মা বোন সন্তান নন? তারা কি মীর্জা মোহাম্মদের ভাই, ভাইপো বা বোনের ছেলে নয়। হতে পারে তারা নামি দামী কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদেরই একজন।

দিপালী তোমার কথা গুলো নিখুঁত সত্য।

দিপালী বলেই চলেছে—কেনো দেশের মানুষ এটুকু বোঝেনা? বোঝার মত কি এতোটুকু অনুভূতি নেই তাদের মধ্যে।

থাকলে হয়তো এমন ভুল করতেন না। বললো জ্যোতির্ময়।

দিপালী এবার দাঁতে দাঁত পিষে বললো—বিদেশীরা বন্ধু সেজে বুকের রক্ত নিংড়ে খাচ্ছে অথচ দেশের মানুষ তাদের খেলার পুতুল বনে গেছে। যে ভাবে নাচাচ্ছে তারা সেই ভাবে নাচছে। মনে করেছে আমার মস্ত জিতে যাচ্ছি। কিন্তু ওরে নরাধম তোমরা যে নিজেদের দেহের মাংস নিজেরা কামড়ে খাচ্ছো সে হিসাব রেখেছো?

জ্যোতির্ময় বললো—বিদেশী চক্রান্ত এরই নাম। নিখুঁতভাবে তারা অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালন করে চলেছে। কারণ তারা বুদ্ধিমান....

আমাদের দেশের মানুষ বড় বেঈমান স্বার্থপর তাই সব সময় নিজের উদর পূরণে ব্যস্ত তারা কোন কথা তলিয়ে ভেবে দেখেন বা ভেবে দেখবার মত সময় করে না, কিসে নিজেদের ইমারত গড়ে উঠবে, কিসে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়াবে কি করে ঐশ্বর্যের পর্বত গড়ে উঠবে সব সময় ঐ চিন্তায় মগ্ন সবাই। নিজেদের স্বার্থের জন্য দুঃস্থ আপন জনদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই কারো।

যাক ও সব কথা এবার বলো দেখি একটু পূর্বে আর্তস্বর শুনতে পেলাম কার কণ্ঠের সে ধ্বনি?

আমিও ঠিক জানিনা তবে শুনেছিলাম কোন এক বুদ্ধিজীবিকে তারা আজ চুরি করে আনবে।

বুদ্ধিজীবি!

হাঁ শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান তাই আমি তাকে বুদ্ধিজীবি বলে থাকি।

কি অপরাধ ছিলো তার?

অপরাধ তিনি নাকি মোসিয়ে খান সম্বন্ধে কোন রকম অসৎ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন দেশের জনগণ যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে মৃত্যু প্রায় এমন দিনে মোসিয়ে খানের গুদামে লক্ষ লক্ষ মন চাউল...

সর্বনাশ সত্যিই এ ধরনের কথা বলা বড় অন্যায় হয়েছে।

সত্য কথা বলেছিলেন বলে তার অন্যায় হয়েছে। রাজকুমার আপনারা সুখী মানুষ দুঃস্থ জনগণের দুঃখ ব্যথা বুঝতে পারবেন না।

সে বুদ্ধিজীবিটিকে কোথায় কি ভাবে রাখা হলো নিশ্চয়ই তুমি জানো দিপালী?

হাঁ চোখে না দেখলেও জানি। যেখানে রাখা হয়েছে সেই অজানা ভদ্রলোকটিকে।

অজানা ভদ্রলোক।

হাঁ আপনাকে একদিন বলেছিলাম হয়তো ভুলে গেছেন। এক অজানা ভদ্রলোক তিনি। কোনদিন তাকে কান্তা বারে দেখিনি হঠাৎ এসেছিলেন এখানে। জানিনা কে তিনি তাকে দেখে কান্তা বারের শয়তানগুলো কানা কানি শুরু করেছিলো। আমি বুঝতে পেরে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। তাকে কৌশলে আটক করে ছিলো কান্তা বারের শয়তানগুলো।

হাঁ এবার মনে পড়েছে ভদ্রলোকটিকে তুমি ভালও বেসেছিলে অল্পক্ষণের মধ্যে।

মিথ্যে নয় রাজকুমার ওকে আমার ভাল লেগেছিলো। সত্যি তার অবস্থার কথা স্মরণ হলে ব্যথায় আমার বুক ফেটে যায়। আপনি যদি তার অবস্থা দেখতেন কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারতেন না কি নৃশংস দৃশ্য। আজ দুই দু'টো মাস বেচারীকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাকে দু'বেলা দু'টো শুকনো রুটি খেতে দেওয়া

হয় আর দু'গেলাস পানি। প্রতিদিন তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। বেচারীর জামা কাপড় ছিড়ে দেহের নানা স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে...উঃ কি ভয়ঙ্কর সে অবস্থা।

জ্যোতির্ময়ের চোখ দু'টো বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠে। বলে সে—দিপালী তুমি নিজের চোখে তার এ অবস্থা দেখেছো?

হ্যাঁ রাজকুমার।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে সেখানে?

সেই দুর্গম স্থানে যাবেন আপনি?

হ্যাঁ দিপালী আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কিন্তু...

বলো থামলে কেনো?

সে স্থানে আপনি যেতে পারবেন না।

কেনো?

অত্যন্ত দুর্গম স্থান।

হোক তবু আমি যাবো দেখবো তাকে। বলো দিপালী আমাকে তুমি নিয়ে যাবে সেখানে।

যদি আমার বাবা কিংবা কান্তা বারের কেউ জানতে পারে তাহলে আমিও মরবো আপনিও মরবেন...

বেশ তো এক সঙ্গে মরতে পারলে অনেক খুশি হতাম কারণ আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবোনা কোনদিন। দিপালী বিশ্বাস করো আমি শুধু একটিবার সেই হতভাগ্যকে দেখতে চাই। কথা দাও আমাকে নিয়ে যাবে?

জ্যোতির্ময়ের আব্দার দিপালী অগ্রাহ্য করতে পারলো না কথা দিলো নিয়ে যাবে সে একদিন কান্তা বারের অভ্যন্তরে সেই অন্ধকারময় গোপন কক্ষে।

এক সময় জ্যোতির্ময় বিদায় গ্রহণ করলো। দিপালী ওকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে এলো।

❑

প্রকাশ্য দিবালোকে দু'খানা গাড়ি এসে থামলো মোসিয়ে খানের গুদামের সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামলো প্রায় বিশ পঁচিশ জন বলিষ্ঠ লোক। সবার দেহেই পুলিশের ড্রেস।

ওরা কান্দাই পুলিশ ফোর্স তাতে কোন সন্দেহ নাই। সবার হাতেই রাইফেল, মেশিন গান। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গুদামে প্রবেশ করলো।

একজন হুইসেল দিলো সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুলিশ বাহিনী গুদামের দরজা খুলে বস্তা বস্তা চাল গম টেনে বের করে আনলো বাইরে।

আশ্চর্য অল্পক্ষণের মধ্যে অগণিত দুঃস্থ নারী-পুরুষ এসে জমায়েত হলো মোসিয়ে খানের গুদামের সম্মুখে।

পুলিশ বাহিনী বস্তা বস্তা চাল গম বিলিয়ে দিতে লাগলো। তাদের মধ্যে।

প্রায় ঘন্টা খানেকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মন চাউল আর গম শেষ হয়ে গেলো। কেউ বা গাড়ি বোঝাই করে চাল নিয়ে গেলো। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে বস্তা তুলে, কেউ বা কাধে বা মাথায় করে।

মোসিয়ে খানের লোকজন কর্মচারী কেউ কোন কথা বলতে পারলোনা বা বলতে সাহসী হলোনা।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেও কারো কাছে কোন জবাব পেলোনা। তিনি তখন মোসিয়ে খানের কাছে ফোন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফোন করবার পূর্বেই একজন পুলিশ ফোনটা রিসিভার সহ তুলে নিলো হাতে। আর একজন তার পিঠে রাইফেলের ঠান্ডা আগাটা চেপে ধরে রইলো।

কাজ শেষ হতে বেশিক্ষণ বিলম্ব হলো না। সমস্ত গুদাম শূন্য হয়ে গেলো। রিসিভার ম্যানেজারের হাতে তুলে দিয়ে বললো পুলিশটি—নিন মালিককে জানিয়ে দেন তার গুদাম ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে।

ম্যানেজার বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

মোসিয়ে খান সবেমাত্র কাপড় চোপড় খুলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলেন ঠিক ঐ মুহূর্তে ম্যানেজারের ফোন পেলেন.....স্যার শীঘ্র চলে আসুন...গুদামের সমস্ত মাল লুট হয়ে গেছে...

দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো ম্যানেজারের বলেন কি তার গুদামে লক্ষ লক্ষ মন মাল রয়েছে—সব মাল লুট হয়ে গেছে এটা কি স্বপ্ন না সত্য কথা।

জামা কাপড় পুনরায় গায়ে চড়িয়ে ছুটলেন গুদাম অভিমুখে। গাড়ি যখন গুদামের দরজায় এসে পৌছলো তখন গুদামের শ্রমিক এবং কর্মচারীগণ কালো মুখে ছুটে এলো তারা কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা খুলে বললো।

পুলিশ বাহিনী এসে নিজের হাতে তার গুদাম খুলে গুদামের সমস্ত মাল দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে এ কথা একেবারে অবিশ্বাস্য তবু বিশ্বাস না করে কোন উপায় নাই।

মোসিয়ে খাঁন নিজের মাথার চুল টানতে লাগলেন এমন কি পুলিশ অফিসে ফোন করে জানাবেন তারও শক্তি দেহে নাই। তবু ফোন করলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীর কাছে।

মিঃ জায়েদী সংবাদ শুনে একেবারে বিস্মিত হতবাক হলেন, তিনি জানিয়ে দিলেন এ ধরনের কাজ পুলিশ বাহিনী করতে পারেনা।

❑

গভীর রাত। মোসিয়ে খান তার কক্ষের মেঝেতে পায়চারী করছিলেন চোখে মুখে তার দারুন চিন্তার ছাপ। প্রায় উন্মাদের মত পড়েছেন, কারণ কোটি কোটি টাকার মাল আজ তার গুদাম থেকে উধাও হয়েছে। মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে তার। নিজে গিয়েছিলেন পুলিশ অফিসে কিন্তু পুলিশ মহল্ল এর কোন বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেনি।

এই ঘটনার পর একেবারে মুষড়ে পড়েছেন মোসিয়ে খান্। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন এসে অনেক বুঝিয়েছেন, সান্তনা দিয়েছেন কিন্তু কোন সান্তনাই তাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি।

বন্ধু বান্ধব সবাই চলে গেছেন বিদায় নিয়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে যে যার কক্ষে। শুধু মোসিয়ে খান এর চোখে ঘুম নাই।

এতোগুলো মাল, এতোগুলো অর্থ আজ তার হস্তচ্যুত হয়ে গেলো এ দুঃখ সামলানো কম কথা নয়।

সমস্ত রাত কাটলো.....

সকালে অনেক বেলা হয়ে গেলো তবু মোসিয়ে খানের ঘুম ভাংলোনা।

দরজায় ডাকা ডাকি তবু কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রথমে সবাই মনে করলো মোসিয়ে খান সারারাত অনিদ্রার পর ভোরে খুব করে ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু যখন এতো ডাকাডাকির পর তার ঘুম ভাংলো না তখন দরজা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলো অনেকে।

দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই সবার চক্ষুস্থির।

মোসিয়ে খানের সমস্ত হীন দেহটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে। ঠিক তার কোলের উপর তারই মাথাটা যত্ন সহ রাখা হয়েছে। রক্তে চুপসে গেছে মেঝের কার্পেটখানা।

মাথায় করাঘাত করে বেগম মোসিয়ে খান রোদন জুড়ে দিলেন। শুধু গুদামের মালই হারালেন না তিনি হারালেন স্বামী রত্নটিকে।

পুলিশ এলো।

নানাভাবে তদন্ত শুরু হলো কিন্তু কে বা কারা মোসিয়ে খানকে এভাবে হত্যা করেছে তার কোন সন্ধান পাওয়া গেলোনা।

খবর পেয়ে হিম্মৎ খাঁ এসে হাজির হলো। মোসিয়ে খানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে মুখ তার মরার মুখের মত বিকৃত হলো। বেশিক্ষণ সে এই দৃশ্য দেখতে পারলোনা প্রাণ ভয়ে পালালো কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে।

পুলিশ মহল মোসিয়ের লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন।

এ হত্যাকান্ডের সংবাদ এক সময় পৌছলো শহরের ঘরে ঘরে।

হোটেল, রেস্তোরা, সিনেমা হলে, ক্লাবে সব জায়গায় এই মস্তক হীন হত্যালীলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

কান্তা বারে জ্যোতির্ময় আর দিপালী প্রেমালাপে মত্ত ছিলো। তারা এই নৃশংস হত্যা লীলার কথা এখনও শোনেনি হয়তো তাই তারা খুশি মনে নানারকম হাসি তামাসা করছিলো।

হঠাৎ হিম্মৎ খাঁ এসে দাঁড়ালো সেখানে, তার চোখে মুখে দারুন উৎকণ্ঠার ছাপ। এসে বললো সে—দিপালী আজ কান্তা বার বন্ধ থাকবে।

দিপালী পিতাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—কেনো?

মোসিয়ে খান নিহত হয়েছে।

বলো কি বাবা?

হাঁ দিপালী কোন দুস্কৃতিকারী তার দেহ থেকে মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেলেছে। গতকাল তার গুদাম লুট হয়েছে। কে বা কারা তার সব মাল গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

বাবা গরিবরা খেতে পায়না, না হয় তা দিলো কিন্তু তাকে হত্যা করলো কারা?

দিপালী দেশটা দুস্কৃতিকারীতে ভরে গেছে। শুধু খুন হত্যা খুন হত্যা.....

জানিনা বাবা কখন তোমার আমার ভাগ্যে কি ঘটবে। ভয় হয় বাবা তোমাকে নিয়ে।

হিম্মৎ খাঁ বলে উঠে—ভয় করবো আমি! দুনিয়া যদি উলটে যায় তবু কোন বেটা আমার গায়ে হাত দিতে পারবেনা। আমি আমার কান্তা ঝরের গোপন কক্ষে থাকবো।

চলে যায় হিম্মৎ খাঁ।

দিপালী বলে—রাজ কুমার আপনি এবার চলে যান। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

জ্যোতির্ময় দিপালীর কপাল থেকে চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো—তুমি যে সেদিন কথা দিয়েছিলে সেই দুর্গম অন্ধকার কক্ষে আমাকে নিয়ে যাবে?

কিন্তু.....

কোন কিন্তু নয় দিপালী.....

দিপালী আর জ্যোতির্ময় এগিয়ে চললো। সমস্ত কান্তাবার নিস্তব্ধ কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই।

দিপালী এগিয়ে চলেছে সুড়ঙ্গ পথে।

জ্যোতির্ময় তাকে অনুসরণ করে চলেছে। আধো অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। দিপালী হাত বাড়ালো জ্যোতির্ময়ের দিকে।

জ্যোতির্ময় ওর নরম হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো একটা তীব্র আর্তনাদ।

পরবর্তী বই

অট্টহাসি